সাধন-বিন্দু

(ধর্ম্মসাধন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী)

এতাং সমাস্থায় পরমাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব ॥

ভাগবত।

"পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত এই পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া আমি ভগবৎ চরণ সেবা দ্বারা দুস্তর অন্ধকারার্ণব উত্তীর্ণ হইব।"

"গ্লীমস্ অব্ দি নিউ লাইট" প্রণেতা

শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত

ও

শ্রীগগনচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।

মূল্য ।০ আনা। ডাক মাশুল ৵০ পয়সা।

সাধন-বিন্দু

(ধর্ম্মসাধন বিষয়ক প্রবন্ধাবলী)।

এতাং সমাস্থায় পরমাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিসেবয়ৈব ॥

ভাগবত।

"পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত এই পরমাত্মনিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া আমি ভগবৎ চরণ সেবা দ্বারা দুস্তর অন্ধকারার্ণব উত্তীর্ণ হইব।"

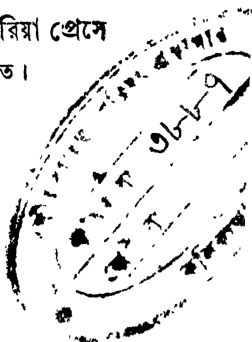
"গ্লীম্‌স্ অব্ দি নিউ লাইট" প্রণেতা
শ্রীসীতানাথ দত্ত প্রণীত

ও

শ্রীগগনচন্দ্র হোম কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯১।



সূচী।

ভূমিকা।

এই "সাধন-বিন্দুতে" ভক্ত সাধকদিগের পিপাসানিবৃত্তি হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদের রসনাও সিক্ত হইবে না। যদি কোন উচ্চ সাধক এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া অপরিতৃপ্ত হন, তিনি জানিবেন যে, ইহা তাঁহার জন্য নহে; ধর্ম্ম সাধনের প্রথম শিক্ষার্থীকে গন্তব্য পথের আভাস মাত্র দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য; এই উদ্দেশ্য কিঞ্চিন্মাত্রও সফল হইলে কৃতার্থ হইব।

এই পুস্তিকার অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক প্রয়োজনে লিখিত এবং সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক গুলিই একটী প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশের সার লইয়া লিখিত। প্রবন্ধ গুলি যখন লিখিত হয়, তখন ইহারা কখনো পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে, লেখকের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। সুতরাং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটী সাধারণ সম্বন্ধ লক্ষিত হইলেও বিশেষ নিকট সম্পর্ক নাই। পাঠক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকে একটী সুপ্রণালী-সঙ্গত সাধনগ্রন্থ মনে করিবেন না। ইহা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম বিষয়ক কতিপয় পরস্পর নিঃসম্পর্কিত বা ঈষৎসম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী মাত্র। একটী প্রণালীর আভাস মাত্র ইহাতে লক্ষিত হইবে।

ইহার অপূর্ণতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মজীবনের অতি অল্প কতিপয় সাধনাঙ্গ মাত্র ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষ কোন গভীর সাধন সম্বন্ধে বলা দূরে থাকুক (লেখক আপনাকে তদ্বিষয়ে ক্ষমতশালীও মনে করেন না;) অনুতাপ, প্রার্থনা, আত্মচিন্তা, পুস্তকপাঠ, সাধুসঙ্গ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি ব্রাহ্মজীবনের সুপ্রসিদ্ধ সাধনাঙ্গ বিষয়েও বিশেষ ভাবে বলিতে পারা যায় নাই। পুস্তকখানি নিতান্তই অসম্পূর্ণ।

সম্প্রতি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তকের বড়ই অভাব; তাহা না হইলে এরূপ পুস্তক প্রকাশের কোন আবশ্যকতা ছিল না। লেখকের পূর্ব্ব প্রকাশিত পুস্তিকা "গ্লীম্‌স্ অব্ দি নিউলাইট" [illegible] তেব পর প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু এক বৎসর কালের মধ্যেই উহার প্রথম সংস্করণ প্রায় নিঃশেষিত

হইয়াছে। অভাবের সময় অযত্ন-সম্ভূত অকিঞ্চিৎকর পদার্থেরও প্রয়োজন হয়; এই কারণেই এই পুস্তক প্রচারিত হইল। উক্ত পুস্তকের এক জন শ্রদ্ধেয় সমালোচক তদনুরূপ এক খানি বাঙ্গলা গ্রন্থ লিখিতে পরামর্শ দেন; কতকটা সেই পরামর্শের অনুশরণেই এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক উক্ত পুস্তকের অনুবাদ নহে, ইহার একটী মাত্র প্রবন্ধ উহা হইতে অনুবাদিত; ইহা উক্ত গ্রন্থের ঠিক অনুরূপও নহে, ইহাতে মত বিষয়ক কোন প্রবন্ধ নাই। উক্ত গ্রন্থ অনেকের প্রীতিকর হইয়াছিল; ইহার সম্বন্ধে সেরূপ আশাও অতি অল্প। যাহা হউক ইহা পাঠ করিয়া যদি একটী আত্মাও ধর্ম্ম সাধনে উৎসাহিত হয়, তবেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

কলিকাতা
আষাঢ় ১২৯১।



সাধন-বিন্দু

সাধনের আবশ্যকতা।

অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য যে যত্ন ও চেষ্টা তাহার নাম সাধন। সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে কোন না কোন বিষয়ের সাধক; কেহ ধনের সাধনা করিতেছে, কেহ যশের সাধনা করিতেছে, কেহ সুখের সাধনা করিতেছে, কেহ বা ধর্ম্মের সাধনা করিতেছেন। শেষোক্ত প্রকার সাধনই আমাদের আলোচ্য বিষয়। অন্য বিষয়ে সাধনের প্রয়োজন ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু ধর্ম্মও যে সাধনের বিষয় ইহা অনেকেই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন না, আর অনেকে বুঝিতে পারিয়াও সাধনে পরাঙ্মুখ থাকেন। অথচ ধর্ম্মসাধন সমুদায় সাধনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কঠিন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দীর্ঘ। অনেক স্থলে বিনা সাধনেই ধন-লাভ হয়, সুখলাভ হয়; অনেক স্থলে অতি অল্পায়াসেই যশো-লাভ হয়; কিন্তু ঐকান্তিক সাধন ব্যতীত কেহ কোন দিন ধর্ম্ম-লাভ করিতে পারে নাই—এবং লাভ করা সম্ভবপরও নহে। সহস্র সহস্র লোক অন্য বিষয় সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছে, এবং ব্যস্ত থাকিবে, কিন্তু ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়শীল ধর্ম্মসাধকের সংখ্যা অতি অল্প, ধর্ম্ম সাধনের কাঠিন্য ইহার একটী প্রধান কারণ। অন্যবিধ সাধন কিয়দ্দিনব্যাপী, কয়েক মাসব্যাপী, অধিক হইলে

কয়েক বৎসর ব্যাপী, তৎপরেই ইপ্সিত সিদ্ধি হস্তগত হয়; কিন্তু ধর্ম্মসাধন অনন্ত, অসীম; ইহাতে পূর্ণ অন্তশীল সিদ্ধি অসম্ভব; ইহার ফল অনন্ত, সুতরাং ইহার ব্যাপ্তিকালও অনন্ত, ইহা আমাদের অনন্ত জীবনের নিত্যসঙ্গী। এই মহৎ সাধনের প্রয়োজনীয়তা কি, বিশেষরূপে আলোচন করা যাক্।

ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম কি প্রথমতঃ তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা আবশ্যক। ধর্ম্ম কি?—ঈশ্বরের প্রতি আমাদের যে কর্ত্তব্য তাহারই নাম ধর্ম্ম। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কি কর্ত্তব্য? তাঁহার স্বরূপ ও আমাদের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা চিন্তা করিলেই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য নিরূপিত হইবে। তিনি আমাদের পিতা মাতা, মুক্তিদাতা, চির নিকটস্থ সহায় ও সুহৃৎ; আমাদের প্রতি তাঁহার প্রেম অনুপম, অটল, অনন্ত। পুনশ্চ,তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার; জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি যাহা কিছু প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপকরণ, যাহা কিছু প্রেমোদ্দীপক, যাহা কিছু হৃদয়মুগ্ধকর, সেই সমস্তই তাহাতে পূর্ণ অনন্ত পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অনন্ত প্রেমময়, অনন্ত সৌন্দর্য্যশালী পরমাত্মার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে—আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাকে প্রীতি করা। আমাদের প্রীতিতে তাঁহার কোন লাভ নাই, আমাদের অপ্রীতিতে তাঁহার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই; অথচ তাঁহাকে প্রীতি করা আমাদের কর্ত্তব্য। এমন প্রেমময় চির সুহৃৎকে, এমন পরম সুন্দর পরমাত্মাকে প্রীতি না করিলে আমরা পশু অপেক্ষাও অধম হই। কিন্তু, তাঁহার প্রীতি ও

সৌন্দর্য্য অসীম, অনন্ত; আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্র, সীমা বিশিষ্ট; আমাদের ক্ষুদ্র প্রেম কি তাঁহার অনন্ত প্রেম, অনন্ত সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রত্যর্পণ হইতে পারে? কথনই নহে। অনন্ত প্রেম অনন্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ প্রতিদান অনন্ত প্রেম ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। তবে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই অনন্ত প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আধারকে কি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতাম, যদি আমাদের আর প্রেমিক হইবার ক্ষমতা না থাকিত। কিন্তু যিনি প্রেমময় তিনিই আবার আমাদিগকে অনন্ত ক্রমিক উন্নতির ক্ষমতা দিয়াছেন; আমাদের হৃদয়কে এমন ভাবে স্থষ্টি করিয়াছেন যে, ইহা তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অনন্ত কাল ক্রমশঃ প্রেমে বর্দ্ধিত হইতে পাবে। সুতরাং এই বিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে:—আমাদিগকে অনন্তকাল প্রেমে বর্দ্ধিত হইতে হইবে। একদিকে অনন্ত প্রেম ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের আস্বাদনাধিকারী হইয়া, এবং অপর দিকে অনন্ত উন্নতির ক্ষমতা পাইয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না; আমাদিগকে অনন্তকাল উন্নতির পথে ধাবমান হইতে হইবে, অনন্ত জীবন ব্যাপিয়া প্রেম সঞ্চয় করিতে হইবে। এই আমাদের একটী ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য।

বিনা আয়াসে বিনা যত্নে এই কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর প্রেমিক হইবার জন্য উপায়াবলম্বন না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে যে প্রেমিক হওয়া যায় না কেবল তাহা নহে, সংসারের প্রতিকূল আকর্ষণে দিন দিন আরো শুষ্ক কঠোর অপ্রেমিক হইতে হয়; সুতরাং এই মহৎ

কর্ত্তব্য সাধনের জন্য সাধন আবশ্যক। এই কর্ত্তব্য অসীম অনন্ত,সুতরাং ইহার সাধনও অসীম—অনন্তকালব্যাপী।

অতঃপর আর একটী কর্ত্তব্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। ঈশ্বর অনন্ত পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের আধার হইয়া আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, আমাদের প্রেমাকর্ষণ করিতেছেন,কেবল তাহাই নহে—তিনি তাঁহার পূর্ণ পবিত্র ইচ্ছা আমাদের বিবেকের ভিতর দিয়া প্রকাশিত করিতেছেন ও তদ্দ্বারা আমাদের ইচ্ছাকে—কার্য্যগত জীবনকে—আকর্ষণ করিতেছেন; তিনি কেবল আমাদের প্রেম চান তাহা নহে, তিনি আমাদের সেবা চান, সমস্ত জীবন চান। আমরা কেবল তাঁহাকে প্রীতি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না; ইহা স্পষ্ট অনুভব করি, তাঁহার সেবা না করিলে, তাঁহার পবিত্র ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য না করিলে, তাঁহার প্রতি সমগ্র কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যের তবে এই আর এক দিক— ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি? আমাদের সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে মহাত্মা ঈশার কথায় বলিতে হয়—"Be ye perfect even as your Father in heaven is perfect." "তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ তেমনি পূর্ণ হও।" তিনি পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ প্রেম, পূর্ণ পবিত্রতার আধার, হৃদয় মন কার্য্যে তাঁহার অনুকরণ করিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় হইতে হইবে। এস্থলেও আমাদের সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য প্রসারিত দেখিতেছি। আমরা ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব,আমাদের হৃদয় মন শক্তি সমুদায়ই সীমা বদ্ধ, অথচ ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার মতন হইতে বলিতেছেন;

কেবল বলিতেছেন তাহা নহে, যত্ন চেষ্টা দ্বারা, তাঁহার কৃপার সাহায্যে, অনন্ত উন্নতির পথে চলিবার ক্ষমতাও দিয়াছেন; সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। আমরা তাঁহার ন্যায় পূর্ণ অনন্ত হইতে পারি না বটে, কিন্তু পূর্ণতার অভিমুখে অনন্ত কাল অগ্রসর হইতে পারি; তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারি না বটে, কিন্তু সাধন বলে ক্রমশঃই সেই সৌন্দর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে পারি; সুতরাং ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যও বিনা সাধনে সাধিত হয় না; বিনা যত্নে কেহই পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইতে পারে না। সাধন হীন জীবন কেমন মলিন, কেমন নির্জ্জীব, কেমন পাপপ্রবণ তাহা আমাদের নিজ জীবনে এবং পার্শ্ববর্ত্তী শত শত লোকের জীবনে স্পষ্টরূপে দেখিতেছি; সুতরাং এই বিষয়েও সাধনের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহ। আমরা দেখিলাম এই কর্ত্তব্যও অনন্ত, সুতরাং ইহার সাধনও অসীম—অনন্ত কালব্যাপী।

আমরা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় দুইটী মূল কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়া ধর্ম্ম-সাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। পাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারিলেন কি যে ধর্ম্ম সাধনের বস্তু, বিনা সাধনে লাভ করা অসম্ভব, আর ধর্ম্মসাধন দুই চারি দিনের কার্য্য নহে, অনন্ত জীবনব্যাপী কার্য্য?

সাধনের বিষয়।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ধর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতার বিষয় বলিয়াছি; এই প্রবন্ধে সাধনের লক্ষ্যের বিষয় বলিব। সাধনের অবশ্যকতার বিষয় বলিতে গিয়াই সাধনের লক্ষ্যের বিষয় কতক

বলা হইয়াছে, কিন্তু এই বিষয় স্বতন্ত্র ভাবে কিছু বিশেষরূপে বলা আবশ্যক।

ধর্ম্ম সাধনের লক্ষ্য অথবা বিষয় তিনটী—ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-ভক্তি, ঈশ্বর-সেবা। ভক্তি ও সেবার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। জ্ঞান লাভের কর্ত্তব্যতাও সুস্পষ্ট। যাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ হইতে হইবে তাঁহাকে যদি না জানিলাম, না দেখিলাম, তাঁহার স্বরূপ ও অভিপ্রায় যদি আমার নিকট অজ্ঞানতা বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া রহিল, তবে কিরূপে তাঁহাকে ভক্তি করিব, কিরূপে তাঁহার সেবা করিব? জ্ঞান ধর্ম্মজগতের আলোক; ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় অন্ধকারাচ্ছন্ন; এই আলোক না লইয়া ধর্ম্মপথে পদচালনা করা নিতান্ত নির্ব্বোধ অথবা দুঃসাহসিকের কার্য্য। জ্ঞান ধর্ম্মরূপ প্রাসাদের প্রথম সোপান, ইহাতে পাদক্ষেপ না করিয়া উচ্চতর সোপানে আরোহণ অসম্ভব। জ্ঞান ধর্ম্মজীবনরূপ গৃহের ভিত্তি; যে ধর্ম্মজীবন এই দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে, এক মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহা নিরাপদ নহে; প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার পতনের আশঙ্কা।

ভক্তির সহিত সেবার যে নিকট সম্বন্ধ পূর্ব্বে তাহা কথঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। ভক্তি ব্যতীত সেবা অর্থহীন, বলহীন। যাঁহাকে ভাল বাসি না তাঁহার কার্য্য করিব কেন? ঈশ্বরকে ভক্তি না করিলে তাঁহার আদেশ পালন করিব কেন? তাঁহাতে, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যেতে যদি আমি কোন হৃদয়াকর্ষণকারী পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে না পাই, তবে তাঁহার কার্য্য করিব কেন? ভাবী দণ্ডের ভয়ে তাঁহার সেবা করিতে

পারি, কিন্তু তাহা হইলে সেই সেবা আন্তরিক সেবা হইল না। উহা বাহ্যিক সেবা মাত্র; এবং প্রকৃতার্থে উহা ঈশ্বর-সেবা নহে—আমার স্বার্থের সেবা মাত্র; সুতরাং ভক্তিহীন সেবা অর্থশূন্য। পুনশ্চ, ভক্তিহীন সেবা বলহীন; প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া, আন্তরিক অনুরাগের দ্বারা চালিত হইয়া যে কার্য্য করা যায় তাহাই সজীব, তাহাই সুসিদ্ধ হয়; এতদ্ভিন্ন যে কার্য্য, তাহা নির্জ্জীব উৎসাহশূন্য, তাহা সুসিদ্ধ হইবার কোন নিশ্চয়তা নাই।

এখন এই ত্রিবিধ সাধনের কয়েকটী অঙ্গ বা অবস্থা প্রদর্শন করিব। ঈশ্বরজ্ঞানের তিনটী অবস্থা—১ম, ঈশ্বর-বিশ্বাস; ২য়, উপাসনা কালীন্ ঈশ্বর-সত্ত্বা-উপলব্ধি অর্থাৎ ধ্যান; ৩য়, কার্য্যগত জীবনে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা এই তিনের মধ্যে যেমন অতি নিকট সম্বন্ধ, জ্ঞানের এই অবস্থা ত্রয়ের মধ্যেও তেমনি নিকট সম্বন্ধ; একটী লাভ না করিলে আর একটী লাভ করা অসম্ভব। প্রথমতঃ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করিতে হইবে; এই বিশ্বাসই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্বরূপ। দুর্ব্বল, চঞ্চল, অসন্তোষকর বিশ্বাস লইয়া ধর্ম্ম সাধন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাতে কিছুই সুসিদ্ধ হয় না, সমুদায় ধর্ম্মজীবন একটী ভগ্ন পতনোন্মুখ গৃহের মতন হইয়া থাকে। জড়জগতের কিংবা আমাদের নিজের অস্তিত্বে যেমন আমাদের অটল নিঃসন্দেহ বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাসও তেমনি অটল সন্দেহাতীত হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিশ্বাস যেমন সহজ, স্বাভাবিক, ইচ্ছা পূর্ব্বক—বলপূর্ব্বক পোষণ করিতে হয় না—ঈশ্বরে বিশ্বাসও তেমনি সহজ, স্বাভাবিক, ইচ্ছা-নিরপেক্ষ হওয়া আব-

শুক। অতঃপর (২) ধ্যান। নিয়মিত উপাসনার সময়ে কিংবা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একান্তমনে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে হইবে। এই ধ্যানে কত উপকার তাহা অল্প কথায় বলা অসম্ভব; সঙ্ক্ষেপে এই মাত্র বলা যাইতে পারে —ইহাতে ঈশ্বর জ্ঞান অতীব উজ্জ্বল ও দৃঢ় হয়; ঈশ্বরের সৌম্য মূর্ত্তি যেন হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। ইহাতে হৃদয়ে রিপুর অত্যাচার প্রশমিত হয়, হৃদয়ের অস্থিরতা দূর হইয়া হৃদয় প্রশান্ত ও গম্ভীর হয়। ইহাতে সংসারাসক্তি দূর হয় ও আত্মা নিয়ত ঈশ্বর সহবাসেব জন্য উৎসুক হয়। এবং পঞ্চমতঃ, ইহাতে হৃদয় নীচ অস্থায়ী সুখলালসা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হয়। তৎপর, (৩) জীবনে ঈশ্বরের চির-বিদ্যমানতা অনুভব। এইটী জ্ঞানের চরমাবস্থা। যাঁহার ঈশ্বরজ্ঞান কেবল শুষ্ক বিশ্বাসে আবদ্ধ নহে, কেবল ক্ষণকাল ব্যাপী উপাসনায় আবদ্ধ নহে, কিন্তু সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত, ঈশ্বরানুভব যাঁহার সমুদয় জীবনকে গ্রহণকালীন্ পূর্ণগ্রাসের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে, যিনি কেবল এখানে ওখানে নয়, এখন তখন নয়, কিন্তু অন্তরে, বাহিরে, গৃহে, কার্য্য ক্ষেত্রে, উপবনে, প্রান্তরে, সর্ব্বত্র, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পদে পদে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত্বা অনুভব করেন, তিনিই উচ্চতম জ্ঞানী। এই উচ্চতম জ্ঞানের জন্য কাহার না হৃদয় পিপাসিত হয়? ইহার অভাবে কোন্ ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি জীবনে অতৃপ্তি অপূর্ণতা অনুভব না করেন? অটল সাধন দ্বারা আমাদিগকে এই উচ্চাবস্থা লাভ করিতেই হইবে, সন্দেহ নাই।

সাধনের বিষয়।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা জ্ঞান, ও জ্ঞানের সহিত ভক্তি ও সেবার সম্বন্ধের বিষয় বলিয়াছি; এই প্রবন্ধে ভক্তি ও সেবার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব।

ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ও প্রেম অনুভব করিয়া হৃদয় যে তাঁহার দিকে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়, এই আকর্ষণের নামই ভক্তি। ইহাই ঈশ্বরের সম্বন্ধে মানব হৃদয়ের উচ্চতম ও সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় অবস্থা; অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই ইহা অনুভব করেন, এই বিষয় অধিক বলা বাহুল্য।

জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিরও তিনটী অঙ্গ অবস্থা বা প্রকাশের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভক্তির প্রথম প্রকাশ উপাসনা কালীন্। যতদিন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার না হয় ততদিন উপাসনা শুষ্ক নীরস থাকে, ততদিন উপাসনা বাক্যাড়ম্বর বা শুষ্ক চিন্তা মাত্র; ভক্তির বিকাশে শুষ্কতা চলিয়া যায়। তখন ঈশ্বর-চিন্তা ঈশ্বর-দর্শনে পরিণত হয়, আর চিন্তার শুষ্কতা ও নিষ্ফলতা দূর হইয়া চিন্তা প্রেম-ফলে ফলবতী হয়। এইরূপে উপাসনা সরস ভাবাপন্ন না হইলে উচ্চতর উন্নতি অসম্ভব। কতকগুলি লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা উপাসনা সাধনে যত্নবান নহেন; দৈনিক উপাসনা গভীর সরস হইল কি না এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নাই, অথচ ইহাঁরা ভক্তির প্রত্যাশী, উন্নতির প্রত্যাশী; ভক্তি লাভের নানা উপায় নির্দ্দেশ বিষয়েও নীরব নহেন। এই শ্রেণীর লোক অতিশয় স্থূলদর্শী। পাঠক পাঠিকা,

দেখিও যেন তোমাকে কখনও এই ভ্রমে না পড়িতে হয়। উপাসনা কালে ধীর গম্ভীর ভাবে ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যের চিত্র হৃদয়ে দর্শন করিয়াও যাহার হৃদয় ভক্তিতে বিগলিত হইল না, সে অন্য সময়ে,—সংসারের কোলাহল মধ্যে —নানা বাসনার উত্তাপে উত্তপ্ত সংসারের কার্য্য-ক্ষেত্রে—ভক্তি সম্ভোগ করিবে,ইহাও কি কখনো সম্ভব ? সুতরাং ঐ সময়টীর দিকে—উপাসনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে তখন ভাল রূপে ঈশ্বরোপলব্ধি হয়—যাহাতে তখন হৃদয় গভীররূপে ভক্তিরসে নিমগ্ন হয়। এই সময়ে হৃদয়ে যত ভক্তির আবির্ভাব হইবে, জীবন ততই ভক্তি-রসে অভিষিক্ত হইবে। উপাসনা ভক্তিরসের ভাণ্ডার স্বরূপ; এখান হইতেই সমস্ত জীবনে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। ইহা জীবনের আলোক-গৃহ-স্বরূপ, এখান হইতেই প্রেমালোক নির্গত হইয়া সমস্ত জীবনকে আলোকিত করে।

কিন্তু আমাদের অনেকেরই ভক্তি এই ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। আমরা উপাসনা কালীন্ এত অল্প ভক্তি সম্ভোগ করি যে তাহা আর জীবনে ব্যাপ্ত হইতে পারেনা। যখন উপাসনা কালীন্ ভক্তির আধিক্য হয় তখনই ভক্তির দ্বিতীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। তখন ভক্তি আর এই ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ থাকিতে না পারিয়া জীবনে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাহাকে অল্প ভালবাসি তাহার সহবাসে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ সুখে কাটাই বটে, কিন্তু তাহার নিকট হইতে উঠিয়া আসিলে আর তাহার কথা মনে থাকেনা, সংসারের কোলাহল মধ্যে সহজেই তাহাকে ভুলিয়া যাই। কিন্তু যাহার মুখের বা জীবনের সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গাঢ়রূপে মুদ্রিত

হইয়াছে, তাহার সহবাসই যে কেবল সুখময় তাহা নহে, তাহার চিন্তাও সুখময়, তাহাকে ছাড়িয়া আসিলেও ভুলা যায় না; সংসারের কোলাহল মধ্যেও সেই সুন্দর ছবি হৃদয়ে জাগিতে থাকে। ঈশ্বর সম্বন্ধে হৃদয়ের এই অবস্থাকেই আমরা ভক্তির দ্বিতীয়াবস্থা বলিতেছি। তখন সাধক ঈশ্বরকে ভুলিতে পারেন না; কোলাহলের মধ্যেও হৃদয় তাঁহার দিকে প্রবলাকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তাঁহার সহবাসের জন্য ব্যাকুল হয়; একটু সুবিধা পাইলেই অমনি সাধক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই অবস্থাতে উপাসনার শুষ্কতা একেবারে চলিয়া যায়, ইহা আর কঠোর কর্ত্তব্য থাকেনা, অতি সুখপ্রদ প্রলোভনের সামগ্রীরূপে পরিণত হয়।

কিন্তু এই অবস্থাও উচ্চতম অবস্থা নহে; ঈশ্বর হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, কিন্তু এখনও জীবন অধিকার করিতে পারেন নাই, সুতরাং এখনও একটী স্থান আছে যেখানে ঈশ্বর ও সাধকের মধ্যে অনেক দূরত্ব রহিয়াছে; সেই স্থান জীবনের কার্য্যক্ষেত্র। সাধক যখন উপাসনার স্থান ছাড়িয়া জীবনে প্রবেশ করেন তখন ঈশ্বরকে তাঁহার স্মরণ থাকে বটে, কিন্তু তিনি কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব দেখিতে পান না; সুতরাং কার্য্যের সময় বাস্তবিক তাঁহার ঈশ্বর-বিচ্ছেদের সময়। এই বিচ্ছেদ যখন দূর হয়, তখন হৃদয়ের ঈশ্বর কার্য্যের ঈশ্বররূপে অনুভূত হন। যিনি হৃদয়ের স্বামী তিনিই আবার জীবনেরও প্রভু এইভাব যখন কেবল মতে নয়, কার্য্যেও অনুভূত হয়, তখনই ভক্তির তৃতীয়াবস্থা উপস্থিত হয়। তখনই ভক্তি সেবারূপে পরিণত হয়, তখনই শুষ্ক কার্য্য ঈশ্বর-সেবা নামের

উপযুক্ত হয়। তখন সমুদায় কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কার্য্যের কঠোরতা চলিয়া যায়। প্রেমাস্পদের জন্য কার্য্য করিতে কে কষ্ট বোধ করে? তখন কার্য্যকালীন্ ঈশ্বর-বিরহ অসম্ভব হইয়া উঠে। ঈশ্বর সম্মুখে থাকিয়া কার্য্য করান, কিরূপে তিনি অদৃষ্ট হইবেন? তিনি হৃদয়ে থাকিয়া হস্তকে পরিচালিত করেন, কিরূপে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে? এই অবস্থাই ভক্তির উচ্চতম অবস্থা, ইহাই সেবার অবস্থা, কর্ম্মযোগের অবস্থা।

পাঠক পাঠিকা, চল আলস্য পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও সেবার সাধনে প্রবৃত্ত হই; স্বর্গের সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া জীবনকে সার্থক করি।

বিশ্বাসের লক্ষণ ও সাধন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি*; এই ত্রিবিধ যোগ ঈশ্বর ও মানবাত্মার মধ্যে বন্ধনরজ্জু স্বরূপ; সংসার ও স্বর্গের মধ্যে সোপান-পরম্পরা স্বরূপ। ইহারা পরস্পর এমন নিকট-সম্পর্কিত যে ইহাদের একটীকে ছাড়িলে অন্যটীকে পাওয়া যায় না; যাঁহার জ্ঞানযোগ সাধন হয় নাই, তিনি ভক্তি লাভে অক্ষম, তেমনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্মযোগ অসম্ভব। অদ্য প্রথমটীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। জ্ঞান—ভক্তি ও কর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ;

* পূর্ব্ব-প্রদত্ত উপদেশে; সেই উপদেশের ভাব এই পুস্তিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে কথঞ্চিত দেওয়া হইয়াছে।

শিথিল-ভিত্তি গৃহের যেমন সর্ব্বদা আপদের আশঙ্কা, সুদৃঢ় জ্ঞান-ভিত্তি-শূন্য ভক্তি এবং কর্ম্মেরও তেমনি আপদের আশঙ্কা। কখন্ ইহাদের পতন হইবে কিছুই স্থিরতা নাই ; তজ্জন্য ধর্ম্ম সাধনের প্রারম্ভে প্রথমেই সর্ব্ব প্রযত্নে জ্ঞানযোগ সাধন আবশ্যক। জ্ঞানযোগের আবার তিনটী অবস্থা বা অঙ্গ, (১) ঈশ্বরে বিশ্বাস, (২) উপাসনা কালীন্ তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি অর্থাৎ ধ্যান, (৩) কার্য্যগতজীবনে তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব। অপর যোগদ্বয়ের পক্ষে যেমন জ্ঞানযোগ ভিত্তিস্বরূপ, তেমনি জ্ঞানযোগের প্রথম সোপান যে বিশ্বাস, ইহা অপর সোপানদ্বয়ের ভিত্তিস্বরূপ। সুদৃঢ় বিশ্বাস সাধন না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের অপর উচ্চতর অবস্থাদ্বয় প্রাপ্তি অসম্ভব। এই সুদৃঢ় অটল বিশ্বাস কিরূপে লাভ করা যায়, তাহারই বিষয় সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা যাক্। প্রথমে দেখা যাক্ প্রকৃত বিশ্বাস কি ?—ইহার লক্ষণ কি কি ? একটী উদাহরণ গ্রহণ করিলেই এই বিষয় পরিষ্কার হইবে। মানুষ যে যে বিষয়ে বিশ্বাস করে তন্মধ্যে জড় জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়, মানুষ কোন প্রকারেই এই বিশ্বাস অতিক্রম করিতে পারে না। কথিত আছে, কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিক এই বিশ্বাস অতিক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু এই কথা যথার্থ নহে ; সাধারণ লোকে জড়ের যে অর্থ করে, তাঁহারা সেই অর্থ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এই মাত্র, জড়কে মানসিক অবস্থাবিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এই মাত্র, জড়ের অস্তিত্বে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। আমার সম্মুখস্থিত এই পুস্তককে আমি নানা ভাবে বর্ণনা করিতে পারি, যথা—ইহা আমার আত্মাবহির্ভূত

স্বতন্ত্র পদার্থ, অথবা বাহ্যশক্তি কিম্বা অজ্ঞানতা-সম্ভূত মানসিক অবস্থা মাত্র। এইরূপ যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পারি, কিন্তু কোন প্রকারে ইহাকে আমার বিশ্বাস-ভূমির বহির্ভূত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কোন না কোন আকারে আমাকে ইহাতে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের এই যে অটল বিশ্বাস, ইহা হইতে প্রকৃত বিশ্বাসের লক্ষণ চিনিয়া লওয়া যাক্। কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই প্রতীতি হইবে এই বিশ্বাসের মধ্যে এই দুটী লক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, দুটী মূলতঃ একই:—প্রথমতঃ ইহা আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ; আমাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক, বল পূর্ব্বক এই বিশ্বাস হৃদয়ে আনিতে হয় না, পোষণ করিতে হয় না, সাধন করিতে হয় না; আমার সম্মুখস্থিত পুস্তক আছে ইহা জানিতে হইলে আমাকে যাহা কিছু ইচ্ছাপূর্ব্বক করিতে হইবে তাহা কেবল এইমাত্র যে আমাকে চক্ষু মেলিয়া রাখিতে হইবে। চক্ষু উন্মিলিত রাখিলে আমি ইচ্ছা করি আর নাই করি পুস্তকের অস্তিত্বে বিশ্বাস আমার মনে আসিবেই আসিবে, ইহাতে আমার ইচ্ছার কোন হস্ত নাই, ইহা বাহ্যিক কারণ-সম্ভূত, সম্পূর্ণরূপে আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ এই বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, অপরিহার্য্য। আমি শত চেষ্টা করিয়াও আমার হৃদয় হইতে এই বিশ্বাস উন্মূলিত করিতে পারি না। ইহার উৎপত্তি যেমন আমার ইচ্ছা-নিরপেক্ষ, তেমনি ইহার বিনাশও আমার ইচ্ছার ক্ষমতাতীত। আমি যেমন ইহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আনয়ন করি নাই, তেমনি আমার ইচ্ছাবলদ্বারা, শত চেষ্টাদ্বারাও আমি ইহাকে দূর করিয়া দিতে পারি না।

ইচ্ছা হইলে আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পারি, ইহার বিষয় না ভাবিতে পারি, কিন্তু যতক্ষণ ইহা আমার জ্ঞানের সম্মুখীন্ থাকে ততক্ষণ সহস্র চেষ্টা দ্বারাও ইহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব; এই বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, অপরিহার্য্য, সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত। এখন প্রশ্ন এই, জড়-বস্তুর সম্বন্ধে এই যে আমাদের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস, ঈশ্বর সম্বন্ধে এই বিশ্বাস কিরূপে লাভ করিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে একটি ঐতিহাসিক তত্ত্বের উল্লেখ করিব। কথিত আছে, সুবিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক ডেকার্ট বিষয় মাত্রই অল্পাধিক সন্দেহ-জড়িত, ইহা দেখিয়া প্রথমে সমস্ত বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সম্বন্ধে কোন না কোন ব্যক্তি সন্দেহ না করিয়াছে; দেখিলেন লোকে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করে, জগতের অস্তিত্বে সন্দেহ করে, নিজ আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করে; এই সমুদায় দেখিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুতেই বিশ্বাস করিব না; যাহা কিছু সন্দেহ করিতে পারি, যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ সম্ভব, তাহাতে বিশ্বাস করিব না; সম্পূর্ণরূপে সন্দেহাতীত যদি কিছু থাকে, যদি এমন কিছু থাকে যাহার সম্বন্ধে সন্দেহ অসম্ভব, যাহার সম্বন্ধে বিশ্বাস অপরিহার্য্য অনতিক্রমণীয়, তবে কেবল তাহাতেই বিশ্বাস করিব। এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি দেখিলেন, তিনি জগতের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন, নিজ আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন; অবশেষে দেখিলেন সমুদায়

বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারিতেছেন, কিন্তু সন্দেহের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে পারিতেছেন না; দেখিলেন এই সন্দেহরূপ চিন্তার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপ সন্দেহাতীত। কিন্তু চিন্তা বলিলেই চিন্তক বুঝায়, চিন্তার আধার আত্মা বুঝায়, সুতরাং চিন্তার অস্তিত্ব যেমন সন্দেহাতীত, তেমনি চিন্তার আধার আত্মার অস্তিত্বও সন্দেহাতীত। এতক্ষণে ডেকার্ট দাঁড়াইবার সুদৃঢ় স্থান পাইলেন, এবং এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তত্ত্বজ্ঞানরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ডেকার্ট দেখিলেন মনোমধ্যে একজন পূর্ণশক্তি, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা স্বরূপ পুরুষের ভাব নিহিত আছে; কিন্তু অস্তিত্ব-গুণ পূর্ণতার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, এই পূর্ণ প্রতিমা অস্তিত্ব-গুণ-বিবর্জ্জিত হইলে ইহা পূর্ণই নহে, অতএব বিশ্বাস করিতে হইবে এই পূর্ণ প্রতিমার প্রতিরূপ একজন পূর্ণপুরুষ অবশ্যই বর্ত্তমান আছেন। এইরূপে ঈশ্বরাস্তিত্বের অকাট্য (অন্ততঃ তাঁহার নিকট) প্রমাণ পাইয়া ডেকার্ট জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি দেখিলেন জগতের অস্তিত্বে আমরা স্বভাবতঃই বিশ্বাস করিয়া থাকি, এই বিশ্বাস স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে উদিত হয়; কিন্তু স্বতঃ উদিত হয় বলিয়াই ইহা সন্দেহাতীত নহে, ইহাতে সন্দেহ করা সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিশ্বাসও সন্দেহাতীত হয়; কেন না তিনিই এই বিশ্বাসের উৎপাদক; তিনি যখন পূর্ণ সত্যের আকর তখন ইহা অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগৎ না থাকিলে তিনি এই বিশ্বাস আমাদের মনে কখনই প্রেরণ করিতেন না। এই রূপে ডেকার্টের হারাণ বিশ্বাস সমূহ তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন

করিল; কেবল প্রত্যাগমন করিল তাহাই নহে, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, চিরদিনের মতন সন্দেহাতীত হইল। এই হইতেই তাঁহার বিশ্বাস-জীবনের আরম্ভ হইল, তাঁহার প্রণীত দর্শন শাস্ত্রের সূত্রপাত হইল। ডেকার্টের তর্ক প্রণালীতে দোষ থাকিতে পারে। থাকিলে উন্নতিশীল জ্ঞান তাহা অগ্রাহ্য করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যে পরম্পরাগত-বিশ্বাস-নিরপেক্ষ, মানবীয় কর্ত্তৃত্ব-নিরপেক্ষ স্বাধীন নির্ভীক চিন্তা এবং সূক্ষ্ম গভীর আত্মদর্শনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক দার্শনিকগণ অটলভাবে তাহারই অনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথই আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের পথ, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিই আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তি। আধুনিক তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাকেই পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করে।

এখন আমার বক্তব্য এই, ডেকার্ট-প্রদর্শিত এই পথই আমার নিকট সুদৃঢ় বিশ্বাস লাভের শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া বোধ হয়। উপাসকগণ, যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে চান, তবে এই পথ অবলম্বন করুন্। আপনাদের কথা বলিতে পারিনা, আমার নিজের কথা সরলভাবে বলিতে হইলে বলিতে পারি আমি অনেক সময় সন্দেহের দংশনে দষ্ট হইয়াছি, আমার বিশ্বাস অনেক সময় সন্দেহ-কুয়াশায় আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু যতদিন প্রকৃষ্ট উপায় দ্বারা ইহাকে নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা না করিয়াছি, যতদিন কেবল 'যেন তেন প্রকারেণ' ইহাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি, ততদিন নির্ভয়, উদ্বেগ-শূন্য, হৃদয়ের তৃপ্তিকর বিশ্বাসের মুখ দেখিতে পাই নাই। অতএব বলি ব্রাহ্ম, যদি তোমার বর্ত্তমান বিশ্বাসকে তৃপ্তিকর সন্দেহাতীত বিশ্বাস বলিয়া

বোধ না হয়, ইহাকে পরিত্যাগ কর; এই বিশ্বাস তোমার বিশেষ কার্য্যকর হইবে না, এই বিশ্বাস লইয়া তুমি নিজের কিম্বা অন্যের জন্য বিশেষ কিছু করিতে পারিবে না। ইহাকে পরিত্যাগ কর; পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখ সেখানে এমন কোন আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাসকণা আছে কিনা যাহা তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য, অনতিক্রমণীয়, সন্দেহাতীত; যাহাতে সন্দেহ করা তোমার পক্ষে অসম্ভব, যাহা বলপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিলেও পুনরায় আসিয়া ইচ্ছার বিরুদ্ধে হৃদয়কে অধিকার করে। যদি থাকে, প্রাণের সহিত ইহাকে অবলম্বন কর; এমন খাঁটি জিনিষ আর নাই; শত শত সন্দেহ-বাদপূর্ণ গ্রন্থও ইহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি এরূপ কিছু না পাও, তবে ভাবিয়া দেখ এমন কোন যুক্তি তোমার আছে কি না, যাহা তোমার নিকট ঈশ্বরাস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া বোধ হয়; যদি থাকে ইহাও বড় কম মূল্যবান বস্তু নহে; পরীক্ষায় অক্ষত থাকিলে ইহার উপরও ভক্তিপ্রেমপূর্ণ ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং হইয়াছে। যদি এ দুয়ের কিছুই খুঁজিয়া না পাও, তবে তোমা অপেক্ষা যাহা-দিগকে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া মনে কর, যাঁহারা বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভূমি পাইয়াছেন বলিয়া আশা হয়, তাঁহাদের নিকট যাও; নিজের কল্পনার উপর বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে বৃথা প্রয়াস পাইওনা। তাঁহাদিগের নিকট যাও, দেখিবে তুমি যেখানে কিছু খুঁজিয়া পাও নাই; তাঁহারা সেখানেই অমূল্য-রত্ন দেখাইয়া দিবেন। তোমার হৃদয়স্থিত অদৃষ্ট জ্ঞান-স্ফুলিঙ্গকে জীবন-পথের আলোকপ্রদ দীপরূপে পরিণত করিবেন।

যাঁহারা জগতে বিশ্বাসী ধার্ম্মিক বলিয়া বিশেষ পরিচিত, তাঁহাদের অনেককেই, হয়তঃ সকলকেই, এক সময়ে এই ক্ষণিক অন্ধকারাবৃত পথ দিয়া বিশ্বাসের আলোকে যাইতে হইয়াছে। আমাদের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক বিশ্বাসগুলির সঙ্গে পরম্পরাগত সংস্কার এত বহুলরূপে মিশ্রিত যে চিন্তাশক্তি প্রস্ফুটিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে যখন এই সমুদায় সংস্কারের ভ্রান্তি বুঝিতে পারি, তখন প্রথমে অনেকগুলি স্বাভাবিক বিশ্বাসকেও পরম্পরাগত সংস্কার মাত্র বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় ইহারাও সন্দেহাচ্ছন্ন হয় ; পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলেই স্বাভাবিক বিশ্বাসবীজসমূহ আবর্জনামুক্ত হইয়া, সন্দেহরূপ কুয়াশার অতীত হইয়া, জীবনে সুফল প্রসব করিতে থাকে। এই সাধন প্রণালী অতীব কঠিন, অতীব কষ্টকর, কিন্তু ইহার ফল পরিণামে সুখময়, মধুময়।

"অন্তরতর অন্তরতম"

"তুমি আমাকে পশ্চাতে ও সম্মুখে ঘেরিয়া রাখিয়াছ, এবং আমার উপরে তোমার হস্ত স্থাপন করিয়াছ।...তোমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব ? তোমার বর্ত্তমানতা হইতে কোথায় পলায়ন করিব ? যদি স্বর্গে উঠি, তুমি সেখানে আছ ; যদি পাতালে অবরোহণ করি, আশ্চর্য্য, সেখানেও তুমি।" দায়ূদের গীত ১৩৯।

এই মহৎ বাক্যগুলি সাধক-হৃদয়ের গভীর জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছে ; ইহাদের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব, যাহা এই জ্বলন্ত বিশ্বাসের একটি উজ্জ্বলতর নিদর্শন। একদিন একজন ব্রাহ্মবন্ধু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত

সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন; তাঁহারা কথোপকথন করিতেছেন এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন ব্যক্তির মুখ হইতে "সত্যম্" এই বাক্য উচ্চারিত হইল। আমাদের ব্রাহ্মবন্ধু বিস্মিত হইয়া দেখিলেন এই মহৎবাক্য শ্রবণ মাত্র মহর্ষির মস্তকের কেশরাশি দণ্ডায়মান হইল, শরীর শিহরিয়া উঠিল। কি জীবন্ত বিশ্বাস! বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় এই মহৎবাক্য তাঁহার শরীর মনকে আলোড়িত করিল। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার "True Faith" নামক পুস্তিকাতে লিখিয়াছেন—"Verily Divine Presence hath electricity. It quickeneth the heart and the nerves, and maketh the very hairs of the body stand erect." "সত্য সত্যই ব্রহ্মের বর্ত্তমানতাতে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। ইহাতে হৃদয় ও স্নায়ু সমূহ সজীব হয় এবং শরীরের লোম পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হয়"। যে জীবন্ত সত্ত্বার নৈকট্য সম্বন্ধে আমরা এই সকল নিদর্শন পাইতেছি, আসুন্ অদ্য তাহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি, বিশ্বাস ও জ্ঞানের সাহায্যে সেই অন্তরতর অন্তরতমের নৈকট্যের বিষয় আলোচনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে চেষ্টা করি।

ঈশ্বর "অন্তরতর অন্তরতম" ইহা গভীরভাবে অনুভব করিতে হইলে পূর্ব্বে জ্ঞানদ্বারা এই বাক্যগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ঈশ্বর নিকটে আছেন; কিরূপে আছেন? এই বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান-মূলক প্রতীতি না থাকিলে শুদ্ধ অন্ধ বিশ্বাস সকল সময়ে কার্য্যকর হয় না। অন্ধ বিশ্বাসকে অনেক সময়েই বুদ্ধি-সম্ভূত সন্দেহের বাণে ক্ষত বিক্ষত, অনেক সময়

বিনষ্টপ্রায় হইতে হয়। তজ্জন্যই এই সম্বন্ধে বিশ্বাস জ্ঞানমূলক বুদ্ধিমূলক হওয়া আবশ্যক, যেন নিতান্ত সূক্ষ্ম কূট বুদ্ধিও ইহার ক্ষতি করিতে না পারে। আচ্ছা, তবে ঈশ্বর অন্তরতম, তিনি নিকটে আছেন, তিনি জীবন্ত ভাবে অন্তরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, ইহাব গূঢ় মর্ম্ম কি ? তিনি কিরূপে আছেন ? প্রথমে দেখা যাক্ তিনি কিরূপে নাই, কিরূপে আছেন বলিলে তাঁহার সম্বন্ধে ভুল বলা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও অনুভব-শক্তির সাহায্যের জন্য আমরা অনেক সময়ই তাঁহাকে স্থান-ব্যাপী, আকাশব্যাপী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি ; কিন্তু সূক্ষ্ম-রূপে দেখিতে গেলে এরূপ বর্ণনা বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত নহে। ভৌতিক পদার্থেরই বিস্তৃতি সম্ভবে ; যিনি আত্মারূপী, মনরূপী নিরাকার জ্ঞান বস্তু, তাঁহার সম্বন্ধে ব্যাপ্তি সম্ভব কি ? আমাদের আত্মার স্থান নির্দ্দেশ যেমন অসম্ভব, আত্মা এখানে আছে সেখানে নাই, মস্তকে আছে হস্তে নাই, হৃদয়ে আছে পদে নাই, আত্মার পরিসর চতুরঙ্গুলি বা এক হস্ত বা দুই হস্ত পরিমাণ, এই সকল কথা যেমন অর্থহীন অজ্ঞান-মূলক, তেমনি ঈশ্বর এখানে আছেন, সেখানে আছেন, অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই সকল কথাও সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে অর্থহীন, অজ্ঞান-মূলক। তিনি কি বায়ু বা ইথার সদৃশ কোন সূক্ষ্ম জড়পদার্থ যে আকাশে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবেন ? স্থান-ব্যাপী বলিলেই তাঁহাকে কোন না কোন আকারে জড়তুল্য করা হয়, তাঁহার নিরাকারত্ব অস্বীকার করা হয়। অথচ তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী চির নিকটস্থ এই কথা মিথ্যা হইতে পারে না। তবে তিনি কিরূপে আছেন ? নিরাকার জ্ঞানবস্তু বলিয়া যদি

স্থানব্যাপ্তি তাঁহার প্রতি প্রযুজ্য না হয়, তবে তিনি কিরূপে সর্ব্বব্যাপী ? প্রথমতঃ—শক্তিরূপে, কারণরূপে, আধার-রূপে। তিনি জীবন্ত জাগ্রত শক্তিরূপে সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাকে কেবল একজন সুচতুর শিল্পী এবং এই জগৎকে ঘটিকাবৎ একটি আশ্চর্য্য শিল্পযন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের নিকট ঈশ্বরের এই শক্তিরূপী জীবন্ত আবির্ভাবের প্রতীতি মলিন, অস্পষ্ট ; জড়বস্তুতে শক্তি আরোপ করিতে গিযা তাঁহারা ঈশ্বরের আবির্ভাব খুঁজিয়া পান না ; হয় সন্দেহ অবিশ্বাসে, না হয় কুসংস্কারে জড়িত হন। কিন্তু যাঁহারা জড়পদার্থের অসাড়তা শক্তিহীনতা জানেন, যাঁহারা শক্তির প্রকৃত আকর চিনিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট জগৎ ব্রহ্মময় ; দূরে, নিকটে, অন্তরে বাহিরে তাঁহার শক্তিরূপী জীবন্ত সত্ত্বা বর্ত্তমান। যেমন তাঁহার শক্তিতে সূর্য্য কিরণ বর্ষণ করে, বায়ু প্রবাহিত হয়, মেঘ বারি বর্ষণ করে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, তেমনি তাঁহা-রই শক্তিতে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হয়, তাঁহারই শক্তিতে হৃদয় হইতে রক্তস্রোত সঞ্চালিত হয়, তাঁহাকেই অব-লম্বন করিয়া আত্মা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবিত থাকে।

আবার, প্রাকৃতিক জগতে তিনি যেমন শক্তিরূপে, জীব-নের আধাররূপে বর্ত্তমান, তেমনি মনোজগতে তিনি জ্ঞানের আধাররূপে চির বর্ত্তমান, চির নিকটস্থ। তিনি কেবল আত্মার দ্বাররূপী ইন্দ্রিয় সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া নিরস্ত রহিয়াছেন, তাহা নহে। প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মনোমধ্যে জ্ঞানালোক প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার নিয়ত কার্য্যশীল শক্তি ব্যতীত

যেমন আমাদের জীবন ধারণ অসম্ভব, তেমনি জ্ঞানলাভও অসম্ভব। তিনি প্রতি নিয়ত চক্ষুতে আলোক প্রেরণ না করিলে চক্ষু দেখিতে পাইত না। তিনি প্রতি নিয়ত বায়ুকে আন্দোলিত না করিলে কর্ণ শুনিতে পাইত না; তিনি প্রতি নিয়ত ইন্দ্রিয়ের উপর কার্য্য না করিলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্য্য-কর হইত না, আমাদের মনে জ্ঞান আনয়ন করিত না। তিনি যেমন জীবনের আধার, তেমনি জ্ঞানেরও আধার। তাঁহারই শক্তিতে মনোমধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও বুদ্ধিঘটিত সত্য সমূহ প্রকাশিত হয়, তাঁহারই প্রভাবে হৃদয় মধ্যে অসংখ্য ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয়। তিনি জীবনের আলোক; তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া যেমন আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারি না, তেমনি তাঁহাকে অবলম্বন না করিয়া আমরা জীবনপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারি না। তিনি জীবন, তিনি জ্ঞান। এইরূপে তিনি চিরকার্য্যশীল শক্তিরূপে, আদিকারণ রূপে, জীবন ও জ্ঞানের প্রস্রবণ রূপে জগতে ব্যাপ্ত, লীন এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। তিনি যেমন বাহিরে তেমনি অন্তরে, প্রাণ মধ্যে, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে; তিনি "অন্তরতর অন্তরতম"।

দ্বিতীয়তঃ, তিনি দর্শক রূপে, প্রেমিক রূপে চিরনিকটস্থ রহিয়াছেন। তিনি কেবল আমাদের জ্ঞানের আধার নহেন, তিনি জ্ঞানী; কেবল প্রেমের আধার ভাবের আধার নহেন, তিনি প্রেমিক, ভাবুক। আমাদের শরীর মন তাঁহার জ্ঞান-সাগরে, প্রেম-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি, প্রেম-জ্যোতি হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিতেছে। এই জ্ঞান ও প্রেমময় আবির্ভাবই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা

মধুর। তাঁহার সর্ব্বদর্শী প্রেমময় চক্ষু আমাকে সর্ব্বদা দেখিতেছে, প্রতিনিয়ত আমার উপর প্রেম বর্ষণ করিতেছে, এই কথা ভাবিলে প্রাণ শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, কঠোরতম দুঃখেরও কঠোরতা চলিয়া যায়। আমি যাঁহার হৃদয়ের ভিতরে ডুবিয়া আছি, যাঁহার প্রেম অন্ন রূপে আহার করিতেছি, পানীয় রূপে পান করিতেছি, বায়ু রূপে সেবন করিতেছি, যাঁহার প্রেম-রসের প্রভাবে আত্মা জীবিত, বর্দ্ধিত ও উন্নত হইতেছে, তাঁহা অপেক্ষা আর কে আমার নিকটতর, অন্তরতর? তিনি আমার মন হইতেও অন্তরতর, কেন না আমা অপেক্ষাও তিনি আমাকে অধিক জানেন, তিনি আমার হৃদয় অপেক্ষা এবং আমার প্রিয়তম সুহৃদের হৃদয় অপেক্ষাও অন্তরতর, কেন না তিনি আমা অপেক্ষাও—আমার প্রিয়তম সুহৃদ অপেক্ষাও আমাকে অধিক ভাল বাসেন; তিনি "অন্তরতর অন্তরতম"।

তৃতীয়তঃ, তিনি বিবেক রূপে, আদেষ্টা রূপে, ধর্ম্ম জীবনের পরিচালক রূপে, অনন্ত জীবনের আদর্শ রূপে চির নিকটস্থ। তিনিই প্রতি নিয়ত হৃদয়ে তাঁহার স্বর্গীয় আদেশ প্রকাশিত করিয়া, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া, ধর্ম্ম জীবনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি প্রভু হইয়া, হৃদয়ের এক মাত্র অধিকারী রূপে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, মনের সমস্ত চিন্তা, ইচ্ছার সমস্ত বল আকর্ষণ করিতেছেন। তিনিই অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের আদর্শ রূপে হৃদয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া হৃদয়কে প্রলুব্ধ করিতেছেন, জীবনকে অনন্ত উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছেন। তিনিই জীবনের লক্ষ্য, তিনিই উদ্দেশ্য, তিনিই চিরবাঞ্ছনীয়, চির অনুসরণীয়। যিনি প্রতি

নিয়ত হৃদয়কে টানিতেছেন, যিনি ক্রমশঃ সমস্ত জীবন মন অধিকার করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহার অপেক্ষা নিকটতর আর কে? তাই বলি তিনি "অন্তরতর অন্তরতম"।

এইরূপে নানা ভাবে তিনি আমাদের নিকটস্থ রহিয়াছেন. অন্তরে বাহিরে আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাতে আর আমাদিগেতে এক তিলও ব্যবধান নাই। কেবল আমাদের হৃদয়—আমাদের অবিশ্বাসী অভক্ত হৃদয়ই তাঁহা হইতে দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। আসুন্ বন্ধুগণ, তাঁহার কৃপার সাহায্যে এই দূরত্ব দূর করি। আসুন্, হৃদয় মন জীবন তাঁহার জীবন্ত জ্ঞানময়, প্রেমময়, পবিত্রতাপূর্ণ সত্ত্বার সাগরে চিরদিনের মত ডুবাইয়া দিই।

ধ্যান।

একান্ত মনে ঈশ্বরের সত্ত্বানুভব—অনিমেষ বিশ্বাসচক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকা, ইহারই নাম ধ্যান। ধ্যানের কঠিনতাবশতঃ আমরা অনেকেই ইহার সাধনে পরাঙ্মুখ থাকি; কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, ইহা অপেক্ষা অধিকতর শান্তি, আনন্দ ও পবিত্রতা দায়ক সাধন আর নাই। ধ্যানে বিশ্বাস চক্ষু উজ্জ্বলতর হয়, হৃদয়ে পাপ ও সংসারের অত্যাচার প্রশমিত হয়, জীবন স্বর্গীয় শান্তি ও আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয় ঈশ্বর সহবাসের স্বর্গীয় আনন্দের আস্বাদন পাইয়া সংসার সুখে বিতৃষ্ণ হয় এবং উচ্চতর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রলুব্ধ হয়। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীরই এই উচ্চ ধর্ম্মাঙ্গ সাধনে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

অকৃত্রিম প্রেমের লক্ষণই এই যে, প্রেম পাত্রকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, বহুক্ষণ বসিয়া দেখিলেও হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না। গভীর ধ্যান অকৃত্রিম ঈশ্বর-প্রেম হইতে—ঈশ্বর-দর্শন-বাসনা হইতে উৎপন্ন হয়। হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেম যত অধিক হয়, ধ্যানে তত আসক্তি বাড়ে; প্রেম শূন্য হৃদয়ে ধ্যানের বাসনা থাকে না। ব্রাহ্ম, যদি দেখ তোমার ধ্যানে আসক্তি নাই, ধ্যান শুষ্ক নীরস বলিয়া হৃদয় পরিহার করিতে চায়, তবে জানিও তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর-প্রেমের বড়ই অভাব হইয়াছে। তোমার জীবন দোষ শূন্য কার্য্যপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু এই সমুদয় সত্ত্বেও তোমার জীবনে আদত খাঁটি বস্তুর বড়ই অভাব। যে এক দণ্ড ঈশ্বরের নিকট স্থির হইয়া বসিতে পারে না, সংসারে যাইবার জন্য ব্যস্ত হয়, তাহার ঈশ্বর-প্রেম আছে কিরূপে বলিব? সুতরাং হৃদয়ে ধ্যানের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখিলে নিশ্চিন্ত থাকিও না, জীবনে মহদনিষ্ট উপস্থিত জানিয়া হৃদয়ের গূঢ় অভাব দূর করিতে যত্নশীল হইও।

আবার দেখা যায় রূপবান্ গুণবান্ প্রেমাস্পদ ব্যক্তিকে যতই দেখা যায়, যত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁহার সহবাসে থাকা যায়, হৃদয় তাঁহার দিকে ততই প্রবলতর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, ততই তাঁহার প্রতি গভীরতর প্রেমের সঞ্চার হয়, ততই তাঁহার সহবাস অধিকতর সুখকর হয়। সুতরাং ধ্যান যেমন এক দিকে প্রেমের ফল, ধ্যান তেমনি আবার প্রেমের বীজ। হৃদয় প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া ধ্যানে প্রবৃত্ত হয়, গভীর ধ্যান আবার হৃদয়ের প্রেমকে বর্দ্ধিত করে, ঈশ্বর-সহবাস-পিপাসাকে বলবতী করে।

উচ্চ হৃদয়-তৃপ্তিকর ধ্যানের অধিকারী হইতে হইলে জীবন

হইতে একটী বিঘ্ন দূর করিতে হইবে। এই বিঘ্ন একবারে দূর করা সম্ভব নহে, ক্রমশঃ দূর করিতে চেষ্টা করিতে হইবে; ইহা যতই দূরতর হইবে, ধ্যান ততই সহজতর, গম্ভীরতর হইবে। সেই বিঘ্ন-সংসারাসক্তি। যোগশাস্ত্রের প্রথমেই বৈরাগ্যের উপদেশ। বৈরাগ্যের অর্থ সংসার ত্যাগ নহে; সংসারাসক্তি—অর্থাৎ সুখ ও স্বার্থলালসা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কাম, অনাসক্ত, ফল-বাসনা-শূন্য-কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়ার নামই বৈরাগ্য। ধ্যানার্থী ব্যক্তি মাত্রেই দেখিয়া থাকিবেন মনের চঞ্চলতাই ধ্যানের প্রধান বিঘ্ন; এই চঞ্চলতার মূল সংসারাসক্তি—সুখলালসা। যাহাব সংসারাসক্তি নাই, সুখলালসা নাই সে ঈশ্বরের পবিত্র সন্নিধান হইতে সংসারে ছুটিয়া যাইতে ব্যস্ত হইবে কেন? সুখলালসা আবার দুই প্রকার—(১) ভাবাত্মক সুখলালসা—সংসারকে সুখকর জানিয়া তাহার দিকে হৃদয়ের গতি, (২) অভাবাত্মক সুখলালসা—আলস্যে ডুবিয়া থাকিবার ইচ্ছা—মানসিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে (effort) বিতৃষ্ণা। এই দ্বিবিধ সুখলালসাই ধ্যান পথের প্রবল বিঘ্ন, ইহাদিগকে দমন না করিয়া অন্য উপায়ে মনের স্থৈর্য্যসম্পাদন চেষ্টা বৃথা। তীক্ষ্ণ আত্ম দৃষ্টি ও ঐকান্তিক যত্ন দ্বারা হৃদয়কে সংসারের অত্যাচার হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া গভীর ধ্যানের অধিকারী করিতে হইবে।

পূর্ব্বে আরাধনা দ্বারা মনকে ধ্যানের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে। আরাধনার কার্য্য ঈশ্বরের সুন্দর মুখকে আত্মার সম্মুখে আনিয়া দেওয়া, ধ্যানের কার্য্য সেই মুখ পানে অনিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকা। আরাধনা যতই উজ্জ্বল সরস হইবে, ধ্যান ততই গভীর, ততই আনন্দকর হইবে; আরাধনাতে ঈশ্বরের

প্রেম ও সৌন্দর্য্য যতই গভীর রূপে অনুভূত হয়, হৃদয় ততই সেই প্রেম ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া থাকিতে অধিকতর আসক্ত হয়। কোন কোন যোগার্থীকে আরাধনা অবহেলা করিতে দেখা যায়। এই ভ্রান্তির মূল আমরা বুঝিতে পারি না। যাঁহার জীবনে যত আরাধনার অভাব, তিনি নির্গুণবাদের ততই নিকট-বর্ত্তী। নির্গুণ ঈশ্বরের ধ্যান কি সম্ভবপর ? যদি সম্ভব হয়, সেই ধ্যানে উপাসকের—প্রেমিক সাধকের কোন প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের প্রেমময় সুন্দর ঈশ্বরকে দেখিতে চাই, তাঁহাতে ডুবিতে চাই ও মজিতে চাই ; আর তাঁহাতে ডুবিতে হইলে, মজিতে হইলে তাঁহাব প্রেম ও সৌন্দর্য্য অনুভব করা চাই, এই অনুভবের নামই আরাধনা। সুতরাং ধ্যানার্থীর পক্ষে আবাধনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

নাম জপ ধ্যানের একটী প্রকৃষ্ট অবলম্বন। ঈশ্বরের অসংখ্য নামের মধ্য হইতে এমন একটি নাম বাছিয়া লও, যাহা তোমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম—যাহা তোমার আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে এমন একটী সম্বন্ধ বুঝায়, যে সম্বন্ধ তোমার নিকট সর্ব্বা-পেক্ষা মিষ্টতম। এই নামটি লইয়া ধ্যানের সময়ে একান্ত মনে জপ করিতে থাক। শুষ্ক অর্থহীন জপ নহে—দেখিতে হইবে যেন প্রতি উচ্চারণেব সঙ্গে সেই নামের অর্থরূপী ভগবানের সত্ত্বা প্রাণের নিকটে অনুভূত হয়। অবিলম্বেই বুঝিতে পারিবে, এই নাম জপ বড় কঠিন ; অন্য চিন্তা আসিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চাহিবে, সংসারের দৃশ্য আসিয়া মনকে সেই দিকে লইয়া যাইতে চাহিবে ; কখন কখন মন বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইবে তাহাও সত্য ; কিন্তু নিরাশ হইতে নাই, সংগ্রামে পরাজিত

হইতে নাই ; নামরজ্জুতে টানিয়া আবার মনকে ঈশ্বর-সমীপে আনিতে হইবে। আবার একান্ত মনে, ভক্তি ও ব্যাকুলতা-পূর্ণ হৃদয়ে নাম জপ করিতে হইবে, আর তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত্বা অনুভব করিতে হইবে। হৃদয়ের ভাব রক্ষা করিয়া যত ঘন ঘন নাম জপ করা যায় ততই ভাল ; ইহাতে অন্য চিন্তা আসিবার অবকাশ পায় না। এই ঐকান্তিক নাম জপের ফল অবিলম্বেই দেখিতে পাওয়া যায় ; মন যতই গভীর-রূপে ধ্যানে মগ্ন হইতে থাকে হৃদয়ে ততই ভাবরসের সঞ্চার হইতে থাকে ; অবশেষে হৃদয় গভীর প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আত্মার মধ্যে প্রেমের তরঙ্গ উঠে। সমুদয় দূরত্ব অন্তর্হৃত হইয়া যায়, সাধকের হৃদয় ও পরমাত্মা প্রেমযোগে একীভূত হইয়া যান। আত্মা তখন স্পষ্ট অনুভব করে এই ইহার শ্রেষ্ঠতম চিরবাঞ্ছনীয় অবস্থা—অনন্ত হৃদয়ে মিশিয়া থাকা, চিরযোগে হৃদয়নাথের সহিত একীভূত থাকা। আত্মা এই স্বর্গীয় অবস্থায় উপনীত হইয়া অতুল আনন্দে ভাসিতে থাকে।

কিন্তু আত্মা জানে এই অবস্থা ইহার পক্ষে সুলভ নহে—বহু কষ্টে উপার্জ্জিত ধন ; জীবনে যোগেব বিঘ্ন অসংখ্য, অনেক সময়ই ইহাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হয়। এই কথা মনে পড়িলেই আত্মা আকুল হইয়া উঠে—এই আকু-লতা হইতেই প্রার্থনার উৎপত্তি ; ধ্যানের পরেই প্রার্থনার স্বাভাবিক সময়। কিন্তু প্রার্থনার বিষয় বলা এই প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে।

পাঠক, পাঠিকা, এই যে উচ্চতম যোগের অবস্থা—যাহা অতুল আনন্দ ও স্বর্গীয় পবিত্রতার উৎস, অথচ এত দুর্লভ,—চল

ঐকান্তিক সাধন দ্বারা ইহাকে আত্মার স্বাভাবিক সহজ লভ্য অবস্থা করিয়া লই।

জপমালা।

হিন্দু, মুসলমান এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ কাষ্ঠ বা স্ফটিক নির্ম্মিত জপমালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা এরূপ জপমালা ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এরূপ জপমালা ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই উদ্দেশ্য বিষয়ে উক্ত সাধক দিগের সহিত আমরা সম্পূর্ণ এক মত; উদ্দেশ্য সাধনের উপায় সম্বন্ধেও বিশেষ মতভেদ নাই। আমরা জপমালা ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু নাম জপের পক্ষপাতী। আমরা কাষ্ঠ বা স্ফটিক নির্ম্মিত, কার্পাস সূত্র গ্রথিত, হস্ত দ্বারা ব্যবহৃত এবং সংখ্যাক্রমে গণিত জপমালার পক্ষপাতী নহি বটে; কিন্তু স্মৃতি-সূত্র গ্রথিত, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে চিন্তিত, চিন্ময় ব্রহ্মনামময় জপমালার পক্ষপাতী। যে সাধক কেবল প্রাতঃ সন্ধ্যা দুই একবার নিমেষব্যাপী শুষ্ক উপাসনা করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন না, যিনি ব্রহ্মসত্ত্বায় ডুবিতে চান, ব্রহ্মসহবাস না পাইলে যাঁহার জীবন অন্ধকার অশান্তিতে পরিপূর্ণ হয়, তাঁহাকে এরূপ নামমালাধারণের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না।

ধ্যান কালীন্ নাম জপের দ্বারা কিরূপ উপকার লাভ করা যায়, কিরূপে একান্ত মনে নাম জপ করিতে করিতে হৃদয় ঈশ্বরের পবিত্র সত্ত্বায় পরিপূর্ণ হয়, কিরূপে হৃদয় গভীর ভাবো-

চ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়, ইতিপূর্ব্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। নাম জপের এরূপ উপকারিতা যে কেবল ধ্যান-কালেই লাভ করা যায় তাহা নহে; চষ্টা করিলে কার্য্য-গতজীবনেও তাহার আংশিক ফল লাভ করা যায়; সুতরাং নামজপ কেবল ধ্যানের সময়ে আবদ্ধ না রাখিয়া ক্রমে ক্রমে কার্য্যগতজীবনে ব্যাপ্ত করিতে হইবে। ধ্যান কালীন্ নাম জপ যত ঐকান্তিক হইবে, যত গভীর ভাবপ্রসূ হইবে, কার্য্যগত-জীবনে তাহা ততই অধিক সুফল প্রসব করিবে। নিয়মিত সাধন কালীন্ যে নাম যত সাধিতে হইবে, কোলাহল পূর্ণ কার্য্যগতজীবনে সে নাম তত সহজে হৃদয় হইতে বহির্গত হইবে,—সে নামোচ্চারণ দ্বারা ভাবোপার্জ্জন ততই সহজতর হইবে।

অন্য সময়ের কথা দূরে থাক্, জীবনের যে সমুদায় মুহূর্ত্ত আমাদের অকার্য্যে অনর্থক যায়, সেই সময়টুকুতেও যদি নাম জপ আশ্রয় করি, তবে জীবন কত না পরিবর্ত্তিত হয়! এই মুহূর্ত্ত কতিপয়ই জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক। এই সময়ে হস্ত এবং মন উভয়ই অবস্থত থাকাতে অসংখ্য অপবিত্র চিন্তা ও অনর্থক কল্পনা হৃদয়ে প্রবেশ করিতে আসে। কত সময়ে এই সমুদায়কে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে দিয়া আমরা হৃদয়কে কলঙ্কিত করিয়াছি। মানসিক বল চালনা দ্বারা এই সমুদায়কে দূর করিয়া দেওয়া যায়, হৃদয়কে এই সমুদায়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায় সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল তাহা করিলেই যে যথেষ্ট হইবে তাহা নহে। অপবিত্র চিন্তার হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেও অসার বিশৃঙ্খল অশান্তিকর চিন্তা-

পরম্পরার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ নহে। এই সমুদায়ও আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে বড় অল্প অনিষ্টকর নহে। একান্ত মনে ঈশ্বরের পবিত্র নাম জপই এই অনিষ্ট নিবারণের প্রকৃষ্ট উপায়। সাধক, যদি সংসারের কণ্টকময় অরণ্যে পথহারা না হইতে চাও, যদি সংসারের উত্তাপে হৃদয় দগ্ধ করিতে না চাও, যদি অসার, বিশৃঙ্খল অশান্তিকর চিন্তা ও কল্পনা বাণে ক্ষত বিক্ষত না হইতে চাও, যদি দৈনিক জীবনের অসংখ্য পরীক্ষা ও বিপদ জালের ভিতর দিয়া যথাসাধ্য সুস্থ মনে চলিয়া যাইতে চাও, যদি দৈনিক কার্য্য কলাপের মধ্যে প্রভুর পবিত্র নৈকট্য অনুভব করিয়া প্রসন্ন এবং উৎসাহিত হইতে চাও, যদি অনুক্ষণ তাঁহার সুশীতল পাদপদ্মের ছায়ায় বাস করিতে চাও, তবে প্রভুর পবিত্র নাম-মালা কখনও পরিত্যাগ করিও না; যেখানে যাও যে অবস্থায় থাক, ভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় ইহাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখ, আর একান্ত মনে জপ কর। পাঠক, হয়তঃ তুমি একাকী পথভ্রমণ করিতেছ? কত অসার অনর্থক চিন্তা আসিয়া এই সময় মনকে ছিন্ন বিছিন্ন করে; এই সমুদায় চিন্তার প্রয়োজন কি? অবিশ্রান্ত প্রভুর নাম জপ কর, সময়ের উৎকৃষ্ট ব্যবহার হইবে। হয়তঃ একাকী কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আছ, কোন বন্ধুর আগমন অথবা কোন উচ্চ কর্ম্ম-চারীর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছ? ঈশ্বরের পবিত্র নাম জপ কর, সময় বৃথা অতিবাহিত হইবে না। হয়তঃ প্রবাসে ধূমশকটে বা জলযানে এমন সঙ্গীদিগের সহবাসে বসিয়া আছ, যাহাদের বাক্যালাপ তোমার অসন্তোষকর বা অনিষ্টকর বোধ হইতেছে। এরূপ সহবাসে থাকিবার প্রয়োজন কি?

তফাৎ হইয়া পড়, যথাসাধ্য নাম জপে নিযুক্ত থাক। হয়তঃ দৈনিক কার্য্যাবসানে বিশ্রাম করিতেছ; ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে প্রভুকে স্মরণ কর, তাঁহার পবিত্র নাম জপ কর,—এমন শান্তি-পূর্ণ বিশ্রাম ভোগ করিবে যাহা সংসারী চিন্তাহীন লোক কদাপি ভোগ করে না। এইরূপে দিবা রাত্রি, অনুক্ষণ, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, ঘরে বাহিরে, সজনে নির্জ্জনে, কার্য্যে বিশ্রামে, সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে ঈশ্বরের পবিত্র সন্তাপহারী নাম আমাদের চিরসঙ্গী থাকিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুক, তাঁহার পবিত্র নামমালা আমাদের কণ্ঠের ভূষণ হউক, আমাদের ক্ষুদ্র দুর্ব্বল সংসারদগ্ধ হৃদয় তাঁহার পবিত্র নামরূপী, স্মৃতিরূপী, বিশ্বাসরূপী সত্তার সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকুক।

ভক্তিপ্রধান ও নীতিপ্রধান ধর্ম্ম।

সচরাচর দুই প্রকার ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ চিত্রিত করিতে গিয়া নীতির কথা, পবিত্রতার কথাই অধিক বলেন। হৃদয় মনের আভ্যন্তরিক বিশুদ্ধতা, পবিত্রতার দিকে হৃদয়ের প্রবল আকর্ষণ, জনহিতকর-কার্য্য-পরিপূর্ণ বহির্জ্জীবন—ইহাই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ। ইহাঁরা যে ভক্তির কথা বলেন না তাহা নহে, ভক্তির কথা না বলিলে ইহাদের ধর্ম্ম ধর্ম্ম নামেরই উপযুক্ত হইত না; কিন্তু মোটা মোটি, ভাবের দিক, প্রীতির দিক ইহাদিগের মধ্যে প্রবল' দেখিতে পাওয়া যায় না। ভক্তির মধুর আস্বাদন, ঈশ্বর-বিরহ-জনিত হৃদয়স্পর্শী

ক্রন্দন, গভীর অভিজ্ঞতা ব্যঞ্জক সাধনতত্ত্ব, ভক্তির প্রকৃতিগত অর্দ্ধ-অবোধ্য অস্ফুট ভাব—ইহাঁদের উপদেশে এই সমুদায় বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জন্যই বোধ হয়, এই চন্দ্রালোকে আলোকিত অর্দ্ধ লুক্কাইত জগতের সহিত ইহাঁদের পরিচয় অল্প। অথচ বলা বাহুল্য যে ইহারা ভক্তির পক্ষপাতী এবং বাক্যে ও কার্য্যে উভয়তঃই ভক্তিপথের পথিক। আমাদের পরিচিত পাশ্চাত্য লেখকদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা থিওডোর পার্কার ও ডাক্তার চ্যানিঙ্ এই শ্রেণীর সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত প্রতিনিধি। এই নীতি-প্রধান, পবিত্রতা-প্রধান ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে পার্কার ও চ্যানিঙের লেখা অপেক্ষা উচ্চতর সহায় আর নাই। জীবিত পাশ্চাত্য লেখকদিগের মধ্যে ভক্তি-ভাজন ঋষি তুল্য ডাক্তার মার্টিনোও সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে এই ধর্ম্মেরই এক জন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি,—যদিও তাঁহার ভাব ও রচনার গভীরতা দেখিয়া তাঁহাকে সময়ে সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ বলিয়া বোধ হইতে পারে।

এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকদিগের বিশেষ ভাব কি দেখা যাক্। এই শ্রেণীর সাধকগণ প্রেমের কথা, ভক্তির কথাই অধিক বলেন। ভক্তিই তাঁহাদের লক্ষ্য; ঈশ্বরকে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার হইব, তাঁহার প্রেমে সমস্ত জীবন ভাসিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহাদের জীবনের উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা। ইহাঁরা যে মুক্তির কথা, পবিত্রতার কথা বলেন না, তাহা নহে, অনেক বলেন; কিন্তু মুক্তি বা পবিত্রতা ইহাঁদের পক্ষে একটী স্বতন্ত্র লক্ষ্য নহে, ইহা ভক্তিরই অঙ্গ বিশেষ মাত্র, ভক্তির অপরিহার্য্য ফল মাত্র। ইহাঁরা কেবল নীতির উচ্চতম আদর্শে জীবন

গঠন করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকেন না, প্রবল প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়া ইঁহারা ক্রমাগত ভক্তির গভীর সাগরে ডুবিতে প্রয়াস পান। সুতরাং ইঁহাদের জীবন পবিত্র হইলেও ইঁহাদের আন্তরিক সংগ্রামের শেষ হয় না, ইঁহাদের অশ্রুপাতের অবসান হয় না। ইহারা ঈশ্বরকে কেবল স্রষ্টিকর্ত্তা পরম পিতা বলিয়া সাধারণ ভাবে ভাল বাসিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন না; তাঁহাকে হৃদয়ের নিতান্ত নিকটস্থ, হৃদয়ের অধিপতি, চির-জীবনের সহায়,আশ্রয় ও অবলম্বন বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, সুতরাং ঈশ্বর সহবাস-জনিত পরমানন্দ, ঈশ্বর-বিরহ ও শুষ্কতা জনিত কঠোর ক্রন্দন, সাধনে কৃতকার্য্যতা জনিত আশা, ভক্তিযোগ হইতে পতন জনিত বিষণ্ণতা প্রভৃতি আন্তরিক তরঙ্গে ইঁহাদের জীবন পরিপূর্ণ। এই ধর্ম্মের প্রচারক অধিক দেখিতে পাই না। ভাগবত প্রণেতা প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব লেখকগণ এবং আধুনিক চৈতন্য সম্প্রদায় ভুক্ত উচ্চতর সাধকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত; দুঃখের বিষয় যে সংস্কৃতে পারদর্শিতার অভাবে এবং ইহাদের গ্রন্থাবলী প্রাচীন ভ্রান্ত মতের আবর্জ্জনাতে পূর্ণ থাকাতে ইহাদের সহিত বিশেষ রূপ পরিচিত হওয়া কঠিন। আমাদের পরিচিত পাশ্চাত্য লেখকদিগের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ফ্রান্-সিস্ নিউম্যান এই শ্রেণীর সাধক, তাঁহার উপদেশ সমূহে এই ধর্ম্মের লক্ষণ সমূহ অনেক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার "The Soul" নামক গ্রন্থ এই নিগূঢ় প্রেম-প্রধান ধর্ম্মের একটী অতি সুন্দর চিত্র। আমি যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে বোধহয় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেনও এই ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মই প্রচার করিতেছিলেন; ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার পূর্ব্ব-

প্রদত্ত এবং যোগ ও ভক্তি শিক্ষার্থীদিগের প্রতি কুটীরে প্রদত্ত উপদেশ সমূহ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ; দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জীবন এখন অন্যবিধ স্রোত অবলম্বন করিয়াছে। *

এখন জিজ্ঞাস্য এই, এই দুই প্রকার ধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর। আমার মতে এবং আশা করি অনেকেরই মতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠতর। মুক্তিকে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া চলিলে ভক্তি পাইতেও পারি, না পাইতেও পারি। ভক্তি ব্যতিরেকেও পবিত্রতা অসম্ভব নহে: ভক্তি বিহীন বৌদ্ধধর্ম্ম পবিত্রতার উচ্চতম আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভক্তি যেখানে, সেখানে পবিত্রতা থাকিবেই থাকিবে। ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়া চলিলে, ভক্তি লাভ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতাও লাভ করিব; পবিত্র না হইয়া ভক্ত হইবার কাহারো অধিকার নাই; পবিত্রতা বিহীন ভক্তি কল্পনা করাও অসম্ভব। ব্রাহ্মের পক্ষে, প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে, পবিত্রতা ভক্তি হইতে স্বতন্ত্র বস্তু নহে, ভক্তিরই অঙ্গ বিশেষ মাত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ জীবন গঠনের নামই পবিত্রতা; ঈশ্বরের ইচ্ছা কি এ সম্বন্ধে যদি জ্ঞান উজ্জ্বল থাকে, তবে প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি পবিত্র না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। ভক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতঃই তিনি পবিত্রতাতেও উন্নত হইবেন, কেন না ঈশ্বর প্রীতি এবং ঈশ্বরের অবাধ্যতা এই দুই বিসম্বাদী বস্তুর একত্র সমাবেশ অসম্ভব। সুতরাং ভক্তি-পন্থীর পক্ষে মুক্তি স্বতন্ত্র লক্ষ্য নহে, মুক্তি ভক্তিরই অপরিহার্য্য ফল। যাঁহার হৃদয় মন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে

---

* এই প্রবন্ধ উক্ত মহাত্মার মৃত্যুর পূর্ব্বে লিখিত হয়।

সমর্পিত হইয়াছে তাঁহার জীবনে পাপের সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং ভক্তিই পরম লক্ষ্য ও চিরজীবনেব অনুশরণীয়। অনন্ত জীবনব্যাপী প্রেমের সাধন ভিন্ন অনন্তপ্রেমের প্রতিদান আর কিসে হইতে পারে? দুঃখের বিষয় এই যে আমরা এখনো এই ভক্তি-প্রধান ধর্ম্মের সমুচিত আদর করিতে শিখি নাই। আমরা ভক্তিশূন্য শুষ্ক নীতিবাদী বলিয়া নিন্দিত, যথার্থই কি আনরা অনেকাংশে এই নিন্দার পাত্র নহি? ঈশ্বর করুন, আমাদের মধ্যে গভীর আত্যন্তিকী ভক্তির আদর বৃদ্ধি হউক।

প্রেম-বীজ

বা

পূর্ণ সৌন্দয্যের আদর্শ।

(১)

মানুষ ঈশ্বরের জন্য এত পাগল হয় কেন? অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় ঈশ্বরের জন্য এত ব্যাকুল হয় কেন? তাঁহাকে পাইলে এত আনন্দিত হয় কেন? ভক্তি-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ভক্তগণ ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হইয়া কখনো হাস্য করেন, কখনো রোদন করেন, কখনো বা বিবশভাবে নৃত্য করেন। আবার দেখি ঈশ্বর বিরহে বঙ্গকুলতিলক চৈতন্য জ্ঞানশূন্য হইয়া কখনো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছেন, কখনো জনশূন্য প্রান্তরে প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো বা সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিতেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত কেবল ভাবপ্রধান বঙ্গদেশে নহে, সকল

দেশেই অল্পাধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। সকল স্থলে এই প্রেমোন্মত্ততার বাহ্যপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কে বলিতে পারে কত হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে, মনুষ্য-চক্ষুর অন্তরালে এই পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত না হইতেছে? মনুষ্য নানা প্রকারে ইহাকে নিবাইতে চেষ্টা করে; এবং নিতান্ত সংসারাসক্ত হৃদয়ে ইহা নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া যায় ইহাও সত্য, কিন্তু কোন না কোন আকারে, কিছু না কিছু পরিমাণে, সকল হৃদয়েই এই ঈশ্বর-পিপাসা, প্রেম-পিপাসা, ভক্তি-পিপাসা দেখিতে পাওয়াযায়। এমন কে আছে যে কোন না কোন সময় ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয় নাই?—তাঁহার জন্য যাহার প্রাণ কাঁদে নাই?—তাঁহার সহিত চিরবাসের জন্য যাহার প্রবল ইচ্ছা হয় নাই? এইপ্রবল সর্ব্বদেশব্যাপী ঈশ্বর-পিপাসার কারণ কি? কর্ত্তব্যজ্ঞানের মধ্যে ইহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের দ্বারা মানুষ নির্দ্দোষ নির্ম্মল হইতে পারে, উন্মত্ত প্রেমিক হইতে পারে না। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিবেককে পরিমার্জ্জিত করে, ইচ্ছাকে নিয়মিত করে, কিন্তু হৃদয়ের বেগ বৃদ্ধি করিতে পারে না; তাহার জন্য অন্যবিধ সাধনের প্রয়োজন। যিনি ধর্ম্মকে কেবল কর্ত্তব্যপালন ও পবিত্রতা লাভ মাত্র মনে করেন, তিনি ধর্ম্মের এই উন্মত্ততার দিক, উচ্ছ্বাসের দিক বুঝিতে পারিবেন না, হৃদয়ের সহিত ইহাকে সহানুভূতিও দিতে পারিবেন না। তবে ইহার মূলকোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যাক্; সেটী এই, মানুষ মানুষের জন্য পাগল হয় কেন? এই সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। মানবীয় প্রেম যে কি প্রবল

তরঙ্গপূর্ণ পদার্থ তাহা অল্পাধিক পরিমাণে সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। নিজের বা পার্শ্ববর্ত্তীদিগের জীবনে ইহার প্রবল প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকিবেন। এমন সুখ নাই যাহা প্রেম না দিতে পারে, 'এমন কষ্ট নাই যাহা মানুষ প্রেমের অনুরোধে সহ্য করিতে না পারে। প্রেমে মানুষ বাঁচিয়া আছে, প্রেমের অভাবে শত শত নর নারী মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে। ইহার কারণ কি? এই প্রেম নামক পদার্থের আকর কোথায়? কেন মানুষ মানুষকে ভাল বাসে? কেন এক হৃদয় আর এক হৃদয়ের জন্য ব্যাকুল হয়? কেন দুটী স্বতন্ত্র হৃদয় এই নিগূঢ় বন্ধনে এক হইয়া যায়?

এই বিষয়ের কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া কেহ কেহ যে সকল মিথ্যা কারণ দর্শাইয়া থাকেন, প্রথমতঃ সে সমস্ত বিদায় করিয়া দেওয়া যাক্। প্রেমের কারণ সুখ-লালসা নহে, স্বার্থপরতা চরিতার্থ নহে। যিনি এই কারণ পাইয়া সন্তুষ্ট হন, তিনি প্রকৃত প্রেম দেখিতে পান নাই। প্রেম স্বার্থপরতার দারুণ বিরোধী; প্রেমের অর্থই নিজের হৃদয়কে অন্যের হৃদয়ে ঢালিয়া দেওয়া—নিজের অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বে বিলুপ্ত করা—নিজের স্বার্থ সুখ ভুলিয়া অন্যের স্বার্থ সুখের জন্য ব্যাকুল হওয়া। এই লক্ষণাক্রান্ত প্রেম ভিন্ন যদি অন্য কোন প্রকার প্রেম থাকে, তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। এখন দেখা যাক্, আমাদের আলোচ্য এই বিশুদ্ধ প্রেমের আকর কি? কেহ কি বলিবেন মানুষ ভালবাসা পাইলেই ভালবাসে, প্রেমই প্রেমের কারণ? ইহাতে প্রশ্নের প্রকৃত মীমাংসা হইল না। জিজ্ঞাসা করি এই কারণরূপী পূর্ব্ব প্রেম কোথা হইতে আসিল?

আর ইহাতো অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভালবাসা না পাইয়াও ভালবাসা হয়; এমন কি প্রেমাস্পদের নির্দ্দয়তা সত্ত্বেও প্রবল প্রেম বিনষ্ট হয় না। তবে ইহার কারণ কি?

সাধ্যানুসারে ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। যে কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, তাহা মানুষিক ও ঐশ্বরিক উভয়বিধ প্রেম সম্বন্ধেই সাধারণ। একই প্রেম প্রস্রবণ হইতে উভয় প্রেম-নদী বহির্গত হয়; উভয়েই বস্তুতঃ একই প্রবল স্রোতস্বতীর ভিন্ন ভিন্ন শাখা মাত্র। ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে একটী বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, মনুষ্য জাতির শিক্ষা ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একটি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বৃক্ষ রূপে পরিণত হইতেছে;—মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরূপ চিত্র ক্রমশঃই মনুষ্যের চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। সেই বীজ কি? সেই চিত্র কি? সেইবীজ, সেই চিত্রের নাম—পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ। বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি না, তাহা আন্তরিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিকাশের পক্ষে সাময়িক ও অস্থায়ী সহায় মাত্র; আন্তরিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছি। কতক গুলি আন্তরিক ভাবের দিকে মনুষ্যের স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে। সৎশিক্ষা ও নৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আকর্ষণ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। সেই ভাব গুলি সত্য, জ্ঞান, ন্যায়, শক্তি, দয়া, স্বার্থহীনতা, সহিষ্ণুতা, বিনয় ও নম্রতা ইত্যাদি। মনুষ্যের যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, আন্তরিক আলোক যতই উজ্জ্বল হইতেছে; ততই সেই সকল স্বর্গীয়

ভাব সম্বন্ধে জ্ঞান পরিষ্কার হইতেছে, ততই এই সমুদয় ভাবের অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণ কল্পনা করিবার শক্তি বাড়িতেছে, ততই এই সমুদায়ের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। যে চিত্রে এই সমুদায় ভাব পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান আছে, তাহাকেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলি। এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে স্পষ্ট রূপে হউক অস্পষ্ট রূপে হউক, পূর্ণরূপে হউক অপূর্ণ রূপে হউক, বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং ক্রমশঃই স্পষ্টতর ও পূর্ণতর হইতেছে।

এই চিত্রের সহিত, এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ কি? ভক্তির সম্বন্ধ কি? সম্বন্ধ অতি গূঢ়তম—কার্য্য কারণের সম্বন্ধ, পর্ব্বত ও নদীর সম্বন্ধ, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ। এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শই প্রেমের আকর, ভক্তির আকর। যখনই মানুষ কাহারো দিকে আকৃষ্ট হয়, তখন ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, সে এই আদর্শের কিছু না কিছু তাহাতে দর্শন করিয়াছে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় অতি অল্প সৌন্দর্য্য দর্শনেই প্রবল প্রেমের উদ্রেক হয়। ইহার কারণ এই, এই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকাতে যে স্থলে মানুষ ইহার অংশ মাত্রও দেখিতে পায়, সে স্থলে কল্পনা দ্বারা অবশিষ্ট অংশ পূর্ণ করিয়া লয়। প্রবল সৌন্দর্য্য-পিপাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সে স্বভাবতঃ তাহার প্রেমাস্পদেতে পূর্ণ সৌন্দর্য্য আরোপ করে। ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য যে, যে পর্য্যন্ত মানুষ স্বচক্ষে না দেখে, সে পর্য্যন্ত সে তাহার প্রেমাস্পদের সম্বন্ধে ঘৃণনীয় কিছু বিশ্বাস করিতে চায় না। যে কল্পিত পূর্ণ-চরিত্র সে তাহাতে আরোপ করে, ইচ্ছা পূর্ব্বক

উহাকে অঙ্গহীন করিতে তাহার হৃদয়ে দারুণ কষ্টের উদয় হয়। এরূপ কল্পনার প্রভাবই অনেক স্থলে প্রবল মানবীয় প্রেমের কারণ। এখন সহজেই দৃষ্ট হইতেছে, মানব-হৃদয়-নিহিত এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ কিরূপে প্রেম ও ভক্তির আকর হইল। মানুষ মানুষের মধ্যে, সম্পূর্ণ ভাবে হউক, অসম্পূর্ণ ভাবে হউক, এই পূর্ণ আদর্শের প্রতিবিম্ব দেখিতে পায়, তাহাতেই মানুষ মানুষের জন্য পাগল হয়, হৃদয় হৃদয়ের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইহাই মানব হৃদয়ের বন্ধন-সূত্র, ইহাই মানব হৃদয়ের উচ্চতম সুখের আকর। এমন কে আছে যে ইহার প্রভাব অনুভব করে নাই?—যে কল্পনাতুলিকা দ্বারা হৃদয়-পটে এই আদর্শ চিত্রিত করিয়া প্রেম উপহারের দ্বারা ইহার পূজা করে নাই? জীবনের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে আমরা অনেক সময়ই মানুষের সম্বন্ধে নিরাশ হই। যাহার সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করি, আশা করি, তাহা অনেক সময় দেখিতে না পাইয়া হৃদয় নিরাশ হয়, ব্যথিত হয়, হৃদয়ের প্রেম-পুষ্প মলিন হইয়া যায়, প্রেমের উচ্ছ্বাস দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, হৃদয় কষ্টযন্ত্রণায় পরিপূর্ণ হয়; কিন্তু সমস্ত নিরাশা, সমস্ত কষ্টের মধ্যেও আত্মার গভীরতম প্রদেশে চিত্রিত এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ বিনষ্ট হয় না, মলিন হয় না, কোন প্রকৃত জীবনে ইহাকে উপলব্ধি করিবার বাসনা নিবৃত্ত হয় না, হৃদয়ের প্রবল সৌন্দর্য্যপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। অনেকে হয়তঃ মাবনজীবনে অনেক পরিমাণে এই আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রেমাস্পদদিগের চরিত্রে হয়তঃ অনেক পরিমাণে ইহাকে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন, পৃথিবীতে স্বর্গসুখের অধি-

কারী হইয়াছেন ; কিন্তু হায়, এরূপ লোকের সংখ্যা কত অল্প! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা এই সুখের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদের পিপাসা কি সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের পূর্ণ আদর্শ কি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হইয়াছে? ইহা অসম্ভব। মানবজীবনে তাহা কিরূপে আয়ত্ত হইবে? চির উন্নতিশীল মানবের আদর্শও চির উন্নতিশীল। তাহার বাসনা অসীম, তাহার পিপাসা অনিবার্য্য। মানবজীবনরূপ ক্ষুদ্র সরোবরে ডুবিয়া তাহাব তৃপ্তি হয় না, মানবজীবনরূপ ক্ষুদ্র কাননের ফল ভক্ষণে তাহার ক্ষুধা মিটে না।

আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর কি তাহা এখন স্পষ্ট অনুভূত হইবে। সংসারে সহস্র সুখদ দ্রব্য থাকিতেও মানুষ কেন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হয়, সংসারে সহস্র সুন্দর বস্তু থাকিতেও মানুষ কেন অরূপ অস্পর্শ ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়, তাহা এখন সহজেই প্রতীত হইতেছে। যাঁহাকে মানুষ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বিশ্বাস করে, যাঁহাতে সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে না তো আর কাহার জন্য ব্যাকুল হইবে? মানব-জীবনের গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে ইহা কিছুই বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না। এই পূর্ণ আদর্শকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না; পাপে নিমগ্ন ব্যক্তির হৃদয়েও ইহার ক্ষণিক আভাস প্রকাশিত হইয়া তাহার নষ্টপ্রায় দেবত্বের পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শতাব্দির উচ্চতর সন্দেহবাদীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও এই পূর্ণতার আদর্শকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই; জীবনের

আলোক ও পরিচালক রূপে ইহা তাঁহাদিগকেও পরিচালিত করিতেছে এবং বিশ্বাস ও ভক্তি রাজ্যের নিকটতর করিতেছে। বন্ধুগণ! এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শকে ক্রমশঃ পরিস্কার রূপে উপলব্ধি করা, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, ইহার আধাররূপী পরমেশ্বরে প্রাণ মন নিমগ্ন করা—ইহাই আমাদের জীবনের পরমোদ্দেশ্য; চলুন, আমরা এই পূর্ণ আদর্শকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া ক্রমাগত স্বর্গরাজ্যাভিমুখে ধাবিত হই।

প্রেম-বীজ

বা

পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে আমাদের হৃদয়-নিহিত ক্রমশঃ বিকাশমান পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শই প্রেম ও ভক্তির আকর। এই আদর্শকে ক্রমশঃ পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করা, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া, এবং ইহার আধাররূপী পরমেশ্বরে প্রাণ মন নিমগ্ন করাই আমাদের জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাক্, এই পূর্ণ আদর্শ হৃদয়ে পরিষ্কার রূপে উপলব্ধি করিবার উপায় কি?—কি কি সাধন অবলম্বন করিলে এই অপরূপ চিত্র হৃদয়ের অন্ধকার রাশি ভেদ করিয়া আমাদের অন্তর্দ্দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থিত হয়, আমাদের সংসারাসক্ত হৃদয়কে মুগ্ধ করে, আমাদের শুষ্ক হৃদয়কে প্রেমামৃতে প্লাবিত করে?

প্রথম সাধন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শন। আপাততঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে কোন সাদৃশ্য আছে

বলিয়া বোধ হয় না। অথচ বাস্তবিক ইহারা একে অন্যের সহায় ; ইহাদের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে উভয়ই সৌন্দর্য্য, উভয়ই প্রেমোদ্দীপক, উভয়ই হৃদয় মুগ্ধকারী, উভয়ই স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা বিনাশক। এই জন্যই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ উপলব্ধির পক্ষে সহায়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতেই হৃদয় প্রথমতঃ সৌন্দর্য্যের ভাব লাভ করে, সৌন্দর্য্যকে আদর করিতে শিখে, সৌন্দর্য্য পিপাসায় পিপাসিত হয়। সেই জন্যই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ধর্ম্মসাধনের সহায় হইয়াছে। সেই জন্যই ধবল-শিখর পর্ব্বত রাজি, শ্যামল তরুরাজি পরিপূর্ণ কানন ভূমি, কলকল শব্দায়মান ও মৃদুমন্দ বায়ু-সেবিত স্নিগ্ধ নদীতট, অসংখ্য তারকাপূর্ণ নীলাকাশ, স্নিগ্ধ জোৎস্না শ্রাবী পূর্ণচন্দ্র, নয়ন-মুগ্ধকর সুগন্ধি কুসুম এই সমুদয় ধর্ম্মসাধকদিগের এত আদরের বস্তু। যে স্থলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনের সুবিধা নাই, সভ্যতা এখন সে স্থানেও সৌন্দর্য্য পিপাসা পরিতৃপ্তির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে ; চিত্রবিদ্যা অনেক পরিমাণে এই প্রয়োজন সাধন করিতেছে। ইহা অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় যে বহুদিন ব্যাপী অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের পর এখন মানুষ বিশুদ্ধ রুচি ও উচ্চতম ধর্ম্মভাবের নিকট-সম্বন্ধ অনুভব করিতে পারিতেছে। নানা উপায়ে রুচির বিশুদ্ধতা সম্পাদন, নানা উপায়ে মানব হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন, ভবিষ্যতে মানবীয় চেষ্টা ও পরিশ্রমের একটী প্রধান বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। যাহাকে এককালে মানুষ বিলাস- প্রিয়তা বলিয়া পরিত্যাগ করিত এবং এখনও অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকেরা ঘৃণা না হউক অনাদরের চক্ষে দেখিয়া থাকেন, ভবিষ্যতে মানুষ উহাকে ধর্ম্ম-

সাধনের অঙ্গবিশেষ বলিয়া সমাদর করিবে সন্দেহ নাই। জড় জগতে হউক, প্রাণী জগতে হউক, প্রাকৃতিক হউক, বা শিল্প-জাত হউক, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, সুন্দর, হৃদয়- মুগ্ধকর, তাহাই হৃদয়কে উন্নত করে, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করে।

ঈশ্বর বাহ্য জগতে তাঁহার সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই ইহা এত সুন্দর, এত প্রাণমুগ্ধকর, ধর্ম্ম সাধনের এমন বলবান্ সহায়। যাঁহাদিগকে তিনি নিজের প্রতিরূপে গঠন করিয়াছেন, নিজের হস্তে যাঁহাদিগকে দিন দিন সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতেছেন, প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহা-দিগকে তাঁহার নিকটতর করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন যে ধর্ম্ম সাধনের আরো উচ্চতর সহায় হইবে তাহা সহজেই আশা করা যাইতে পারে। আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির দ্বিতীয় সাধন সাধু মহাত্মাদিগের জীবনালোচনা। প্রকৃতি আমাদের হৃদয়ে আধ্যা-ত্মিক সৌন্দর্য্য-পিপাসার উদ্রেক মাত্র করে, তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না, কারণ ইহাতে সে সৌন্দর্য্য নাই; এই সৌন্দর্য্য পিপাসার আংশিক পরিতৃপ্তি ও বৃদ্ধিব স্থান মানব জীবন। সাধু মহাত্মা দিগের জীবন অসাক্ষাৎ ভাবে, পুস্তকের সাহায্যে, কিঞ্চিৎ মাত্র আলোচনা করিয়াও এত উপকার লাভ করা যায় যে ইচ্ছা হয় এরূপ একটি জীবন পাইলে রাত্রি দিন তাহাতে নিমগ্ন হইয়া থাকি, সংসারের সঙ্কীর্ণতা, মলিনতা ও অশান্তি হইতে চিরদিনের মতন মুক্তি লাভ করি। মানুষ যে অনেক সাধু মহাত্মাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; তাঁহাদের জীবনে অসাধারণ, অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে যে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধার পর-

মেশ্বরের সহিত একীভূত করে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। এখন পর্য্যন্ত যে অগাধ জ্ঞানশালী পাশ্চাত্য ধার্ম্মিকগণ মহাত্মা ইশাকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহাও বড় বিস্ময়কর নহে। আমরা এই সকল কুসংস্কার অতিক্রম করিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতো নিশ্চয় যে, এই সকল পবিত্র, সুন্দর জীবন দেখিয়াই জগতের অধিকাংশ লোক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আভাস পায়, এই সকল সুন্দর চিত্র দেখিয়াই আমরা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাব লাভ করি, ইহাদেব উচ্চ জীবন দেখিয়াই উচ্চতর জীবন কল্পনা করিতে সমর্থ হই। ইহাদের সৌন্দর্য্য পান করিয়াই আমাদের হৃদয়ে প্রবল হইতে প্রবলতর সৌন্দর্য্যপিপাসার উদ্রেক হয়। খ্রীষ্টীয় জগতের যে সকল ধর্ম্মবীরগণ সত্যের জন্য অম্লানবদনে অসংখ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অমানুষিক বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিতে করিতে নিতান্ত দুর্ব্বল নির্জ্জীব জীবনেও বলের সঞ্চার হয়। মহাত্মা ইশার স্বর্গীয় বিশ্বাস, প্রেম, বিনয়, ক্ষমা ও নির্ভরের ভাব আলোচনা করিতে করিতে কাহার না হৃদয় এই সমুদায় স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়? ঊনবিংশ শত বৎসর মানব হৃদয় হইতে তাঁহার চিত্র মুছিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশীয় বুদ্ধদেবের ঐকান্তিক অনাসক্তি ও বৈরাগ্যের ভাব একবার আলোচনা করিলে আর ভুলা যায় না, জীবন পথে তাঁহার প্রবল আকর্ষণ সর্ব্বদাই অল্পাধিক পরিমাণে হৃদয়কে টানিতে থাকে, ইচ্ছা হয় একবার তাঁহার অনুসরণ করিয়া, একেবারে সংসারের সমুদয় বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া, কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হই; আর তাঁহার মতন অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা হইয়া সংসারে পুনঃ

প্রবেশ করি। ভক্ত প্রধান চৈতন্যের জীবনালোচনা করিতে করিতে বোধ হয় সম্মুখ দিয়া একটী প্রবল প্রেমের ঝড়, ভক্তির বন্যা বহিয়া যাইতেছে; কাহার না ইচ্ছা হয় এই প্রবল ঝড়ে উড়িয়া যাই—এই প্রবল প্রেমভক্তির স্রোতে জীবন মন ভাসাইয়া দিই? যাহা হউক, বিশেষ রূপে এই সকল মহাত্মা ব্যক্তির নামোল্লেখ করাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, কেবল ইঁহাদিগকেই আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ রূপে নির্দ্দেশ করিতেছি। না, তাহা নহে; মনুষ্যজগৎ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; অনেক হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান হইয়াও মানবজীবন-রূপ সমুদ্র অসংখ্য রত্নের আকর; প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রেণীর বাহিরেও ঈশ্বর প্রভূত সৌন্দর্য্য রাশি ঢালিয়া রাখিয়াছেন। খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের তো কথাই নাই, লোকপ্রসিদ্ধির অন্তরালে, সংসারের কোলাহল শূন্য নির্জ্জন স্থান সমূহে, আমাদের পার্শ্বে, গৃহে, আত্মীয় সমাজে, অনেক মনুষ্যরত্ন আছেন, যাহাদের জীবন মনের সৌন্দর্য্য হৃদয়ের শান্তি-উৎস, সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ উপলব্ধির দৈনন্দিন সহায। এই তবে আমাদের দ্বিতীয় সাধন—মানব জীবনে স্বর্গের যে আলোক পড়িয়াছে, যে সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক দর্শন করা, প্রাণের সহিত সম্ভোগ করা, তাহাকে আদর করিতে শিখা; তাহা হইলে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ হইতে পূর্ণতর ছবি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে, হৃদয় ক্রমশঃই প্রবলাকর্ষণে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইবে।

কিন্তু উপরোক্ত সাধনদ্বয় হইতেও গুরুতর, কঠিনতর আর একটী সাধন আছে; এখন তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। পূর্ব্ব

প্রবন্ধে বলা হইয়াছে এবং ইহা সকলেই জানেন,যে মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আদর্শ, সেই পরম সুন্দরের মুখচ্ছবি চিত্রিত রহিয়াছে, এবং জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টতররূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই জ্ঞানজ্যোতি, ধর্ম্মজ্যোতি প্রতিনিয়তই ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন। কিন্তু এই স্বর্গীয় আলোকের যে যতদূর আদর করে, সদ্ব্যবহার করে সে তত পরিমাণে ইহার অধিকারী হয়, ততই সেই স্বর্গীয় চিত্র তাহার নিকট উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হয়; তাহার প্রেমোচ্ছ্বাস ততই বৃদ্ধি পায়। তেমনি যে ইহার যত অনাদর করে তাহার চক্ষু ততই ইহার সম্বন্ধে অন্ধ হইতে থাকে, সেই স্বর্গীয় চিত্র তাহার নিকট ততই মলিন অস্পষ্ট হইতে থাকে, তাহার হৃদয় ততই শুষ্ক, কঠোর হইতে থাকে। সুতরাং আমাদিগকে বিশেষ যত্নবান্ হইতে হইবে যেন আমরা কখনো এই স্বর্গীয় আলোকের অনাদর না করি, যেন ইহাকে দৈনন্দিন জীবনের পরিচালক করিয়া ক্রমাগত স্বর্গ রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। কার্য্যে, চিন্তায়, ভাবে, যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু মলিন, যাহা কিছু কুৎসিৎ বলিয়া বোধ হইবে, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা হইতে দূরে থাকিতে হইবে। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে; প্রত্যহ জ্ঞান ও বিশ্বাস মিশ্রিত কল্পনার বর্ণে সেই সৌন্দর্য্যের চিত্র সাধ্যানুসারে হৃদয়ের সম্মুখে অঙ্কিত করিতে হইবে। কার্য্যে, চিন্তায়, ভাবে স্বকীয় পরকীয় ও ঐশ্বরিক সম্বন্ধে আমার জীবন যেরূপ হওয়া উচিত সেই আদর্শ কল্পনা চক্ষে দেখিতে হইবে ও তাহার সহিত বর্ত্তমান

জীবনের তুলনা করিতে হইবে। এই তুলনার ফল কি, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহাতেই হৃদয়ের আলস্য জড়তা দূর হইয়া হৃদয় উৎসাহ উদ্যমে পরিপূর্ণ হয়,ইহাতেই জীবন-স্রোতের গতিরোধক হিমরাশি বিগলিত হইয়া জীবন অবাধে উন্নতির পথে চলিতে থাকে, এবং ইহাতেই সেই পরম সুন্দর পরমাত্মার পূর্ণ সৌন্দর্য্যময় মুখচ্ছবি উজ্জ্বলতর রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হয়।

পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আধারকে দেখিতে হইলে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইতে হইলে, চির জীবনের মতন তাঁহাব প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইতে হইলে, এই ত্রিবিধসাধন এবং আরাধনা প্রভৃতি অন্যান্য সাক্ষাৎসাধন অবলম্বন কবিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদের সাধনেব সহায় হউন।

আরাধনা।

বিশ্বাস চক্ষে ঈশ্বরের বহুমুখ-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তিতে বিগলিত হওয়াব নাম আরাধনা। আরাধনা ভাবের উৎস—ভক্তিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন। যে ব্রাহ্ম আরাধনা করেন না, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধকারে পড়িয়া থাকেন,—স্বর্গের আলোকে আলোকিত, স্বর্গের সৌন্দর্য্যে শোভিত মনোমুগ্ধকর ব্রহ্ম-মন্দিরের বহির্দ্দেশে অবস্থিতি করেন; চক্ষুব সমক্ষে প্রসাবিত অমৃত সাগরের তীরে বসিয়া দারুণ পিপাসা ভোগ করেন। পাঠক, পাঠিকা, আমাদের যেন এরূপ মূর্খতা না হয়।

বিশেষ ভাবে আরাধনার আলোচনার পূর্ব্বে ইহাকে উপাসনার আর একটি অঙ্গ হইতে পৃথক করা যাক্। কেহ কেহ

আরাধনা করিতে গিয়া বড়ই গোলযোগ করেন ; ইহারা আরাধনার মধ্যে অথবা আরাধনারই নামে উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন আরাধনার পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্গ ; উদ্বোধনের উদ্দেশ্য মনকে আরাধনার জন্য প্রস্তুত করা ; উত্তমরূপে উদ্বোধন না করিয়া আরাধনা আরম্ভ করা উচিত নহে। নির্জ্জন উপাসনায় উদ্বোধনের সহায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, সৎচিন্তা ও ঈশ্বরের কৃপা প্রার্থনা। যে পর্য্যন্ত না এই সকল উপায়ে মন ধীর গম্ভীর হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা পরিস্কাররূপে উপলব্ধ হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত আরাধনা আরম্ভ করা উচিত নহে। যিনি আরাধনা করিতে করিতে মধ্যে বলিয়া উঠেন "হে ঈশ্বর, তুমি কোথায়, আমি তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমি তোমার বিষয় কি জানি, কি বলিব, তোমার কৃপা ভিন্ন আমি কিছুই করিতে পারি না, তুমি এক বিন্দু প্রেম না দিলে আমি কিরূপে তোমার উপাসনা করিব" ইত্যাদি—তাঁহার ব্যাকুলতা ও সরলতা প্রশংসনীয় হইতে পারে, কিন্তু তিনি স্পষ্টই দেখান যে তিনি তখনও আরাধনা-মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, মন্দিরের দ্বারে বসিয়া আঘাত করিতেছেন। এরূপ অপ্রস্তুতাবস্থায় কখনো আরাধনা আরম্ভ করা উচিত নহে। আরাধনা ব্যাকুলতা নহে—প্রাপ্তি, সম্ভোগ ; ক্ষুধা নহে—আহার ; পিপাসা নহে,—জলপান।

আমরা "ঈশ্বরের বহুমুখ-সৌন্দর্য্য দর্শনের" কথা বলিয়াছি। "বহুমুখ-সৌন্দর্য্য দর্শনের" অর্থ বিবিধ স্বরূপ উপলব্ধি। ঈশ্বরের অনেক স্বরূপ, অনেক গুণ ; এক একটী স্বরূপ আমাদের সহিত এক একটী সম্বন্ধ ব্যঞ্জক। এক একটী স্বরূপ পৃথক

পৃথক ভাবে বিশ্বাসপূর্ণ চিন্তার সহিত উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তদুপযোগী ভাব অনুভব করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের আরাধনাতত্ত্বের সার কয়েকটী বেদবচনে নিহিত আছে, যথা—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

ইহার অর্থ—"ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ. যিনি আনন্দ ও অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্তি স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, তিনি পবিত্র স্বরূপ নিষ্কলঙ্ক।" আনন্দ, অমৃত এবং শান্তি প্রায় একই পদার্থ; সুতরাং আমরা এস্থলে এই কয়েকটী স্বরূপ পাইতেছি—সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, প্রেম (মঙ্গল), অদ্বৈত্য, পবিত্রতা। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় ঈশ্বর এই সপ্ত স্বরূপে আরাধিত হইয়া থাকেন। নির্জ্জন উপাসনার সময়ে ঠিক এই ভাবে না হউক, অনেকটা এই ভাবে তাঁহার আরাধনা করা উচিত। পূর্ণ স্বরূপে ঈশ্বরের আরাধনা না করিলে আত্মা সমগ্র ভাবে উন্নত হয় না, ইহার উন্নতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে; যথা,—যিনি কেবল ঈশ্বরের অনন্তভাবের আরাধনা করেন তাঁহার বিস্ময়,বিনয়, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণ গুলি বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু প্রীতি পবিত্রতা প্রভৃতি কোমল-তর গুণ গুলি অনুন্নত থাকে। তেমনি যিনি কেবল তাঁহার প্রেমস্বরূপেরই আরাধনা করেন, অনন্ততা, পবিত্রতা প্রভৃতি স্বরূপ উপলব্ধি করেন না, তাঁহার মধ্যে ভাবুকতা এবং সুখ-প্রিয়তা অযথা প্রবল হইয়া উঠে, জীবনের পবিত্রতা ও কার্য্য-

কারিতার দিকে দৃষ্টি কমিয়া যায়। আবার যিনি কেবল তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতারই আরাধনা করেন, তাঁহার প্রেম কোমলতা অনুভব করেন না, তিনি ক্রমে শুষ্ক ক্ষমাশূন্য নীতিবাদী হইয়া উঠেন, তাঁহার হৃদয়ের প্রেম দয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে না; সুতরাং আরাধনা প্রশস্ত, পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর আত্মারূপী, তিনি অনন্ত আত্মারূপে আমাদের ক্ষুদ্র আত্মার সহিত সম্বদ্ধ। আত্মা বলিলেই এই কয়টী স্বরূপ স্পষ্টতঃ বুঝায়—শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য। ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকারে অনন্ত, সুতরাং অনন্তভাব তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য এই চারিস্বরূপের সহিত মিলিত হইয়া আছে; তিনি অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পূর্ণ। অন্ততঃ এই চারি স্বরূপে প্রত্যহ তাঁহার আরাধনা করা উচিত। তিনি যে অনন্ত শক্তিরূপে প্রকৃতির ভিতরে কার্য্য করিতেছেন, প্রাণরূপে জীবন রূপে আমাদের আধার অবলম্বন হইয়া আছেন, অনন্ত জ্ঞানরূপে সর্ব্বদা আমাদের অন্তর বাহির দেখিতেছেন, অনন্ত প্রেমরূপে আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, নানা সুখবিধান করিতেছেন, ক্রমাগত ধর্ম্ম পথে অগ্রসর করিতেছেন, নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ পবিত্র স্বরূপ রূপে জীবনের আদর্শ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন, হৃদয়ের পরম প্রভু রূপে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন্ সেবা আকর্ষণ করিতেছেন এই সমুদায় ভাব প্রতিদিন উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করা উচিত। এরূপ উপলব্ধিতে হৃদয়ে যে কি গাঢ় মধুর ভাবরসের সঞ্চার হয়, কি যে মনোহর ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয় তাহা কেবল তাঁহারাই জানেন, যাঁহাদের জীবনে এরূপ আরাধনা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে; তাহা বর্ণনার বিষয় নহে,—অনুভবের বিষয়।

কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে এরূপ আরাধনাতে বুঝি একই কথা প্রত্যহ বলিতে হয়; এরূপ আরাধনা যাঁহাদের অভ্যস্ত, তাঁহাদের দৈনিক উপাসনা কালীন্ হৃদয়ে নিত্য নব নব ভাব বিকশিত হয়, ঈশ্বরের চির পুরাতন স্বরূপ সমূহ নিত্য নব নব বর্ণে রঞ্জিত হইয়া হৃদয়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়; সেই পুরাতন সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য নামক ভাবপ্রণালী সমূহে নিত্য নব নব ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইয়া আসে,—আসিয়া প্রবল প্লাবনে সন্তপ্ত পিপাসিত হৃদয়কে প্লাবিত করে। যিনি মনে করেন এই প্রাচীন প্রণালী সমূহ ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিয়া ভাব অন্বেষণ করিবেন, তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত, তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভূগোল ভুলিয়া গিয়াছেন; তিনি প্রেম, পুণ্য, শান্তির উৎস কোথায় তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন।

আবাধনাকে ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন বলিবার তাৎপর্য্য পাঠক এখন বুঝিতে পারিবেন। আরাধনার সময়ে ঈশ্বরের গৌরবান্বিত পরম সুন্দর মুখচ্ছবি আত্মাতে প্রতিভাত হয়, হৃদয় সেই সুন্দর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিগলিত হয়, প্রেম ও ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত হয়। এরূপ সাধনের ফল কি তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে; ইহাতে ক্রমশঃই হৃদয়ে ঈশ্বর-দর্শন-পিপাসা প্রবলতর হয়, ক্রমশঃই হৃদয় প্রবলতর আকর্ষণে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্রমশঃই প্রাণে গাঢ়তর প্রেমের সঞ্চার হইতে থাকে।

সরস গভীর আরাধনা সম্ভোগ করিতে হইলে একটী কার্য্য জীবনে অভ্যস্ত করিয়া লইতে হইবে; সে কার্য্যটী ঈশ্বর-চিন্তা। ঈশ্বরের সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি স্বরূপের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা গভীর চিন্তা দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

বাহ্য জগতে, মনুষ্য জগতে, বিশেষভাবে আমাদের স্বীয় স্বীয় জীবনে এই সমুদায় স্বরূপের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে পরিষ্কার উজ্জ্বল ভাব লাভ করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে জ্ঞান যত উজ্জ্বল হইবে, সাধারণতঃ আরাধনা তত গভীর ও সরস হইবে। চিন্তা জ্ঞানের আকর; দিব্যজ্ঞান স্থায়ী গভীর প্রেম ভক্তির অবশ্যম্ভাবী কারণ।

আরাধনার একটী মহা বিঘ্নের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। কেহ কেহ আরাধনা করিতে গিয়া বিস্তৃত স্বরূপ বর্ণনাতে প্রবৃত্ত হন; বর্ণনা করিতে করিতে বাহিরের কথা আনিয়া ফেলেন, ঈশ্বরের উজ্জ্বল আবির্ভাব হইতে বহুদূরে চলিয়া যান। ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। বর্ণনা মাত্রই দূষণীয় নহে, বরং বর্ণনা অনেক সময়েই স্বরূপ উপলব্ধির সহায় হয়; কিন্তু সতর্ক হইতে হইবে যেন স্বরূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মনের একাগ্রতা কমিয়া না যায়, আত্মার দৃষ্টি মলিন হইয়া না যায়, ঈশ্বরাবির্ভাবের আলোক ক্ষীণ হইয়া না যায়। সমুদায় চিন্তা সমুদায় বর্ণনার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন্ত সত্ত্বানুভব যত্নের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করিতে হইবে। বহুস্বরূপ-সমন্বিত সেই সত্ত্বা অনুভব করিয়া হৃদয় যাহাতে ভক্তি প্রেমে বিগলিত হয়, অনন্ত পবিত্রতার বৈদ্যুতিকস্পর্শে চমকিত অনুপ্রাণিত হয়, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আরাধনা চিন্তা নহে, বর্ণনা নহে; চিন্তা ও বর্ণনা আরাধনার সহায় মাত্র। আরাধনা ভাব;—গভীর রূপে প্রেম ভক্তি পবিত্রতা প্রভৃতি ভাব অনুভব করা, গভীর ভাবের সাগরে প্রাণ মনকে নিমগ্ন করা—ইহাই আরাধনা সাধনের উদ্দেশ্য।

আধ্যাত্মিক সতীত্ব।

গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কতিপয় অভিনব সুখ ও দুঃখ, আশা ও নিরাশার উদয় হয়; শুষ্ক নীতিবাদী এবং সংসারের প্রচলিত গভীরতাশূন্য চলন-সই ধর্ম্মের নিকটে এই সমুদায় সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিবেক যতই কোমল হইতে থাকে, কর্ত্তব্যের ভূমি যতই বিস্তৃত হইতে থাকে, ততই নব নব পাপ ও পুণ্য—যাহাদিগকে পূর্ব্বে পাপ পুণ্য বলিয়া বোধ হইত না—অন্তর্দ্দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করে। এই নব পরিচিত পুণ্য সমূহের মধ্যে একটীকে উৎকৃষ্টতর নামের অভাবে—আধ্যাত্মিক সতীত্ব বলা যাইতে পারে। ইহার প্রকৃতি কি, কিরূপে আত্মা ইহার দর্শন পায়, ইহার সাধন প্রণালী কি এই বিষয়ে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে।

যতদিন আত্মা ঈশ্বরকে কেবল জগতের সৃষ্টি ও পালন কর্ত্তা বলিয়া পূজা করে, যতদিন তাঁহার সহিত কোন ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অনুভব করিতে না পারে, ততদিন ধর্ম্ম গভীরতাশূন্য ও শুষ্ক থাকে; ততদিন ইহাতে সংগ্রাম থাকেনা; সুখ দুঃখ থাকেনা। যখনই আত্মা ঈশ্বরের সহিত নিকটতর সম্বন্ধ অনুভব করে—যখন বুঝিতে পারে তিনি কেবল জগতের ঈশ্বর নহেন, আমার নিজেরও ঈশ্বর, তিনি কেবল সাধারণভাবে নহে, বিশেষভাবে আমাকে দেখিতেছেন, বিশেষভাবে আমাকে যত্ন করিতেছেন—আত্মা যখনই ইহা অনুভব করে, তখন হইতেই তাঁহাকে কোন একটী সুমিষ্ট নামে আহ্বান করিতে

আরম্ভ করে। এই ভাব হইতেই ঈশ্বর পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু, নাথ এবং অপরাপর অসংখ্য মধুর নামে অভিহিত হইয়াছেন। ঈশ্বরের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সাধারণতঃ দুটী কথায় বর্ণিত হইয়া থাকে, যথা—তিনি পিতা, তিনি প্রভু। আধ্যাত্মিক সাধনের পক্ষে সাধারণতঃ এই সম্বন্ধ-দ্বয় যথেষ্ট বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এবং সাধকদিগের প্রিয় নাম-রূপে গণ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বোধহয়, আত্মা ঈশ্বরের সহিত যে গভীর ও সুমধুর যোগে সংযুক্ত হইতে সক্ষম, এবং যে যোগের জন্য ইহা পিপাসিত হয়, এই নামদ্বয়ের কোনটীই সেই যোগসম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতে পারেনা। "পিতা" বলিলে একদিকে ঈশ্বরের পিতৃ-স্নেহ ও অনুপম যত্ন এবং অপর দিকে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং বাধ্যতা প্রভৃতি কর্ত্তব্যের বিষয় বিশেষরূপে মনে পড়ে। "প্রভু" এই ডাক আমাদের বিবেকের সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং জীবনকে উৎসাহ এবং বিশ্বস্ততাপূর্ণ কর্ত্তব্য পালনে প্রণোদিত করে। অনেকের নিকট বোধ হইতে পারে এই দুই ভাব মিলিত করিলেই ঈশ্বরের সহিত আমা-দের যে সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহার পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত হইল। কিন্তু বাস্তবিক তাহাই কি? পিতৃ-স্নেহ এবং যত্ন ভিন্ন কি ঈশ্বর আমাদিগকে আর কিছু দেন না, আর পুত্রের ভালবাসা এবং ঐকান্তিক সেবা ব্যতীত কি আমাদের নিকট আর কিছু চান না? পৃথিবীতে কি পিতার কিংবা মাতার ভাল-বাসা অপেক্ষা গভীরতর, কোমলতর, মধুরতর ভালবাসা নাই? আর যদি থাকে, তবে এই শেষোক্ত ভালবাসাই কি ঈশ্বরের

অনন্ত গভীর ও অনন্ত কোমল ভালবাসার উৎকৃষ্টতর উপমা নহে? তেমনি, পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কিংবা প্রভুর প্রতি ভৃত্যের আসক্তি ও অনুরাগ অপেক্ষা কি পৃথিবীতে গভীরতর, মধুরতর আসক্তি ও অনুরাগ নাই? আর যদি থাকে, তবে ঈশ্বরের সম্বন্ধে আত্মার যে সম্বন্ধ এবং কর্ত্তব্য এই শেষোক্ত অনুরাগই কি তাহার উৎকৃষ্টতর প্রতিমা নহে? অন্যের কথা বলিতে পারিনা; আমাদের বোধ হয় "পিতা" নামের সমস্ত মধুরতা সত্ত্বেও এবং "প্রভু" নামের সমস্ত শ্রদ্ধা অনুরাগ ও আকর্ষণী-শক্তি সত্ত্বেও আত্মার উন্নতির অবস্থাবিশেষে, অন্ততঃ কোন কোন উচ্চ ভাবাবেশের সময়ে এই নামদ্বয় আত্মাকে পূর্ণ তৃপ্তি প্রদান করিতে পারেনা। এই নামদ্বয় যে সম্বন্ধ প্রকাশ করে, আত্মা তখন তদপেক্ষা একটী গভীরতর, মধুরতর সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধের ঐশ্বরিক বা মানবিক কোন দিকই এই নামদ্বয় প্রকাশ করিতে পারেনা। বিশেষতঃ মানবিক দিক অতি অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়। মানব কাহার নিকটে হৃদয়ের গভীরতম দুঃখের কান্না কাঁদে, কঠোরতম কষ্টের কথা বলে, উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে, কিংবা প্রিয়তম বাসনা জ্ঞাপন করে? তাহা পিতার নিকটেও নহে, মাতার নিকটেও নহে। কাহার বক্ষে মাথা রাখিবার জন্য হৃদয় অধিকতর লালায়িত হয়? আর কোথায়ই বা উচ্চতর শান্তি লাভ করে? সে পিতার বক্ষেও নহে, মাতার বক্ষেও নহে। ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভক্তির দৈনিক প্রকাশ সমূহের সহিত বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষা দাম্পত্য-প্রেমের লক্ষণ সমূহেরই অধিক সাদৃশ্য। এই জন্যই আত্মা ঈশ্বরকে "প্রাণে-

শ্বর" বলিয়া সম্বোধন করে, এবং ক্রমশঃ তাহার সহিত এমন একটী সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে থাকে, যাহা গভীরতা, মধুরতা ও বিশ্বস্ততায় পৃথিবীর উচ্চতম দাম্পত্য-প্রেম অপেক্ষাও অনেক উচ্চতর। ক্রমশঃ যতই আত্মা ঈশ্বর প্রেমের অনুপম কোমলতা এবং অনন্ত গভীরতা অনুভব করিতে থাকে, ততই আবার বুঝিতে পারে, ঈশ্বর ইহার নিকট হইতে অধিকতর প্রেম ও অনুরাগ চাহিতেছেন; বুঝিতে পারে, হৃদয় এবং জীবনের কেবল মাত্র নৈতিক পবিত্রতা, সৎকার্য্যে কেবলমাত্র বাহ্যিক ব্যস্ততা—এই সমুদায় যথেষ্ট নহে, ঈশ্বর ইহার নিকট আরো কিছু চান। বুঝিতে পারে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মরাজ্যে এই সমুদায়ের নিজের কিছু মূল্য নাই, ইহারা বিশ্বস্ত অনুরাগের স্বতঃপ্রসূত চিহ্ন বলিয়াই মূল্যবান্। ঈশ্বর কেবল বাহিরের কার্য্যশীলতা চান না, তিনি সর্ব্বোপরি তাহা চান, যাহা সমুদায় বাহ্যিক কার্য্যশীলতার আকর। তাহা কি? না,—হৃদয়। আর, তিনি যে হৃদয়ের একটী ক্ষুদ্র অংশমাত্র চান তাহা নহে; সমস্ত হৃদয় টুকু, অন্ততঃ ইহার অভ্যন্তরস্থ উচ্চতম স্থানটী চান। ঈশ্বর-প্রেমের মতন এরূপ সর্ব্বগ্রাসী বস্তু আর কিছু নাই; ইহা আমাদের নিকট ইটী অথবা সেটী এরূপ কোন বিশেষ দ্রব্য চায় না। হৃদয়, মন, আত্মা, শরীর, সর্ব্বস্ব চায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ঈশ্বরের সহিত এই সম্বন্ধানুভবের সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ের নিকট ঈশ্বরের এই প্রেমানুরাগ ভিক্ষা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে কতিপয় অভিনব, অদৃষ্টপূর্ব্ব কর্ত্তব্য ও সংগ্রাম, সুখ ও দুঃখের আবির্ভাব হয়। এই অভিনব কর্ত্তব্য সমূহেরই একটীর নাম আধ্যাত্মিক সতীত্ব—হৃদয়েশ্বরের প্রতি হৃদয়ের সুদৃঢ়, অটল,

অচঞ্চল বিশ্বস্ততা। আধ্যাত্মিক সুস্থাবস্থায় আত্মা নারীনির্ব্বিশেষ যত্ন ও শুদ্ধাচারের সহিত ইহার সতীত্বব্রত পালন করে। ইহার প্রাণপতি যে স্থানে উপবিষ্ট, সংসারের সুন্দরতম বস্তুকেও ইহা সে স্থান স্পর্শ করিতে দেয় না। তাঁহার প্রীতি এবং সেবার আনন্দ অপেক্ষা আর কোন বস্তু হৃদয়কে অধিকতর আনন্দিত করিবে, প্রভুর উচ্চতম প্রশংসা লাভের লিপ্সা অপেক্ষা অন্য যশোলিপ্সা হৃদয়ে প্রবলতর হইবে, অথবা ঈশ্বর লাভের বাসনা অপেক্ষা অন্য কোন বাসনা হৃদয়ে অধিক বল-শালী হইবে, আত্মা ইহা হইতে দেয় না। যদি কখনো এরূপ কিছু ঘটে, আত্মা উহাকে সত্য সত্যই ব্যভিচার বলিয়া, হৃদয়েশ্বরের বিরুদ্ধে ঘোরতম পাপ বলিয়া, তজ্জন্য কঠোর অনুতাপে অনুতপ্ত হয়। কিন্তু হায়, এরূপ সুস্থাবস্থা কি দুর্ল্লভ! ইহাকে সুস্থতা বলিয়াই আমাদের জ্ঞান নাই। সংসারে ব্যভিচার দেখিলে আমরা কত না ক্ষোভ ও রোষপরবশ হই; কিন্তু হায়! হৃদয়েশ্বরের সম্বন্ধে আমাদের নিজ হৃদয় কত না ব্যভিচারী, অপবিত্র, অবিশ্বস্ত! প্রতিদিন কত শত বস্তু আমাদের হৃদয়ে আধিপত্য করিতে আসে, আর আমরা কতবার তাহাদিগকে হৃদয়ে আনিয়া হৃদয়-প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের সিংহাসনকে কলুষিত করিতে দিই! হায় হায়, কতবার এই ব্যভিচার, এই অবিশ্বস্ততা, এই অপবিত্রতার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া কঠোর ক্রন্দনের সহিত প্রতিজ্ঞা করিলাম এবার হইতে চিরদিনের মতন বিশ্বস্ত হইব, কিন্তু পুনঃ পুনঃই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলাম। কিন্তু নিরাশ হইব না। তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইব ইহা যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে যেমন তাঁহার

ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের জীবনেও তেমনি হইবে। চল ভাই, ক্রমাগত প্রার্থনা করি, আর সতর্কভাবে আত্মরক্ষা করি, তাহা হইলে একদিন অবশ্যই তাঁহার আশীর্ব্বাদে এই সংগ্রামের অবসান হইবে।

ভিকারী ঈশ্বর।

মানুষ ঈশ্বরের নিকট ভিকারী হয়, প্রার্থী হয়, এ কথা অনেক বার শুনিয়াছি; কিন্তু ঈশ্বর মানুষের দ্বারে ভিকারী হন, মানুষের নিকট প্রার্থী হন, এ কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ, অভাবপূর্ণ মানুষ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থী হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? মানুষ অজ্ঞানাবস্থায় ঈশ্বরের নিকট ধন চায়, মান চায়, যশ চায়, সুখ চায়; উন্নতাবস্থায় পুণ্য চায়, ভক্তি চায়, শান্তি চায়। কিন্তু যিনি বিশাল বিশ্বের অধিপতি, যাঁহার কিছুরই অভাব নাই, তিনি ক্ষুদ্র মানবের দ্বারে ভিকারী হন, ইহা নিতান্তই বিস্ময়কর কথা। অথচ এ কথা নিতান্ত সত্য। ইহা অন্ধ বিশ্বাসের কথা নহে, দিব্য জ্ঞানচক্ষে দেখিতেছি বিশাল বিশ্বের অধিপতি ক্ষুদ্র মনুষ্যের দ্বারে ভিকারী বেশে দণ্ডায়মান! তিনি মানুষের নিকট কি চান? তিনি পবিত্রতা চান, প্রেম চান, ভক্তি চান; হৃদয় চান, মন চান, জীবন চান। ধর্ম্ম-জীবনপথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার মতন ব্যগ্র ও অতৃপ্ত ভিকারী আর নাই। তাঁহার একটি কথা শুনিয়া চল, তাঁহার একটী বাসনা পরিতৃপ্ত কর, অমনি দেখিবে তিনি আরো কত কি চাহিয়া বসিবেন। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রভু

বলিলেন, সন্তান, তোমার এই একটী গুরুতর পাপ আছে ইহাকে পরিত্যাগ কর; পরিত্যাগ করিলাম; অমনি প্রভু আর একদিন আসিয়া বলিলেন, ঐ দেখ তোমার আরো কতকগুলি পাপ রহিয়াছে, এই গুলিও ছাড়িতে হইবে। এক একটি করিয়া সব গুলিই ছাড়িলাম, মনে করিলাম বুঝি নিশ্চিন্ত হইলাম, বুঝি প্রভু পরিতৃপ্ত হইলেন। কৈ, প্রভু ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইলেন না, প্রভু আর একদিন আসিয়া বলিলেন, সন্তান, ইহাতেও হইবে না, কেবল পাপ পরিত্যাগ করিলে হইবে না, অভাবাত্মক পবিত্রতায় আমি পরিতৃপ্ত হই না, তোমাকে অনন্ত পবিত্রতার স্রোতে প্রাণকে ভাসাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং তাহারই উদ্যোগ করিতে হইল। প্রভু একদিন বলিলেন, সন্তান, প্রাতঃ সন্ধ্যা দুবেলা আমার উপাসনা করিতে হইবে। সম্মত হইলাম; মনে করিলাম, বুঝি প্রভু ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবেন। তিনি তেমন ভিকারী নহেন; একদিন আসিয়া বলিলেন, সন্তান, ইহাতে হইবে না, তুমি নিয়মিতরূপে উপাসনা কর বটে, কিন্তু উপাসনাতে তোমার মন নিমগ্ন হয় না; আমি চাই যে তুমি যখন উপাসনা করিবে, তখন তোমার হৃদয় মন প্রেমরসে, ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইবে, নীরস উপাসনাতে আমি পরিতৃপ্ত হই না। তাহাই করিলাম, প্রভুর ইচ্ছানুসারে সরস উপাসনা সাধন করিতে লাগিলাম, হৃদয় মন উপাসনা কালে গলিতে লাগিল, উপাসনার মধুরতা অনুভব করিতে লাগিলাম। ইহার অধিক প্রভু আর কিছু চাহিবেন ভাবিতেই পারি নাই, মনে করিলাম এবার প্রভুকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বাসনা

অনন্ত, তিনি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। একদিন আসিয়া বলিলেন সন্তান, ইহাতেও হইবে না; তুমি দুবেলা উপাসনার সময় আমার প্রেমরস আস্বাদন কর বটে, আমার প্রেমে নিমগ্ন হও বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় এখনও সংসারাসক্ত রহিয়াছে; তোমার প্রেমাস্বাদন সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী মাত্র, আমি ইহাতে পরিতৃপ্ত থাকিতে পারি না; আমি চাই তোমার সমস্ত জীবন প্রেমে নিমগ্ন হয়, তোমার উপাসনার ভাব সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়; কেবল উপাসনার সময়ে নহে, কিন্তু সমস্ত দিন তোমার হৃদয় আমার প্রেমরসে ডুবিয়া থাকে। শুনিয়া অবাক্ হইলাম; প্রভু কি চাহিতেছেন? ইহা কি আমি দিতে পারিব? অথচ তাঁহার অনুরোধও অগ্রাহ্য করিতে পারি না। দিতে পারি আর না পারি, প্রভু মহান্ সংগ্রামে ফেলিলেন। এইরূপে তিনি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর বাসনা লইয়া হৃদয়-দ্বারে উপস্থিত হন, তাঁহার বাসনার সমাপ্তি নাই। প্রভু জীবনে সৎকার্য্য দেখিতে চাহিলেন, সৎকার্য্য করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রভু তাহাতে পরিতৃপ্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, কেবল আমার উদ্দেশে কতকগুলি কার্য্য করিলে চলিবে না, সমস্ত কার্য্য আমাকে দিতে হইবে; আমি তোমার সমস্ত কার্য্যগতজীবন চাই। প্রভু তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে বলিলেন, চিন্তা করিতে লাগিলাম; কিন্তু প্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, বলিলেন কেবল সময়ে সময়ে আমার চিন্তা করিলে চলিবে না, আমার জন্য এবং আমার কার্য্যের জন্য আমি তোমার সমস্ত চিন্তা চাই। প্রভু বলিলেন,

আমাকে ভালবাস, ভালবাসিতে লাগিলাম, প্রভুকে হৃদয়ের একাংশ ছাড়িয়া দিলাম; কিন্তু তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত হইবার নহেন। বলিলেন, সন্তান, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট নই, তোমার হৃদয়ের অংশমাত্র লইয়া আমি তৃপ্ত থাকিতে পারি না, আমাকে সমস্ত হৃদয় দিতে হইবে। এইরূপে তিনি অশেষ অনন্ত বাসনা লইয়া প্রতিনিয়ত হৃদয়-দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় অতৃপ্ত, অতি-ব্যগ্র, সর্ব্বগ্রাসী ভিক্ষুক আর নাই।

এই সমস্ত কি কল্পনার কথা? কবিত্বের কথা? এই সমুদায় কি জ্ঞান-বিরুদ্ধ, যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা?—না, কখনই নহে। এই সমুদায় কেবল বিশ্বাসের কথা নহে, এই সমুদায় উচ্চতম জ্ঞানের কথা; সূক্ষ্মতম যুক্তিও এই সমুদয়ের অনুমোদন করে। ভাবিয়া দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, এই জগতের একজন জ্ঞানবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাঁহারা ইহাও বিশ্বাস করেন, যে তিনি ইচ্ছাময়; জগতের সম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে; জগতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই সমুদায় ইচ্ছা ক্রমশঃই সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সাধারণ ভাবে জগতের সম্বন্ধে যেমন তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে, প্রত্যেক মানবের সম্বন্ধেও তেমনি তাঁহার কতকগুলি ইচ্ছা আছে; তিনি ইচ্ছা করেন প্রত্যেক মানব ক্রমশঃ জ্ঞান, পুণ্য এবং প্রেম ভক্তিতে উন্নত হয়। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কি আমাদের ইচ্ছার মতন? আমাদের ইচ্ছার সমুচিত বল নাই, আমাদের বাসনার যথেষ্ট গভীরতা নাই, আমাদের প্রার্থনায় সমু-

চিত ব্যগ্রতা নাই। অনন্ত হৃদয় যিনি তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার বাসনা, তাঁহার প্রার্থনাও কি এইরূপ? কখনই নহে। তাঁহার ইচ্ছা অনন্তবলশালিনী, তাঁহার বাসনা অনন্তরূপে গভীর, তাঁহার প্রার্থনা অনন্ত ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ, কোটী ভিক্ষুকের ব্যগ্রতা এক করিলেও তাঁহার ব্যগ্রতার সমান হয় না।

এই অনন্ত ইচ্ছা, অনন্ত বাসনা, অনন্ত ব্যগ্রতা লইয়া প্রভু নিয়ত আমাদের হৃদয়দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; কি নিষ্ঠুর, কি পাষণ্ড আমরা, তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি না! কতবার তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে তাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু তিনি নিরাশ হইবার নহেন, শত বিড়ম্বনাতেও নিরস্ত হইবার নহেন। হায়, এই হৃদয় যে তাঁহার, এই মন যে তাঁহার, এই জীবন যে তাঁহার; তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই চাহিতেছেন, তবে আর দিই না কেন? প্রভু করুন, আর যেন পাষণ্ড হইয়া না থাকি, আর যেন নির্দ্দয়রূপে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য না করি। প্রভু করুন, যেন প্রাণ, মন, জীবন সমস্ত তাঁহাকে দিয়া চিরদিনের মত তাঁহার হইতে পারি।

কার্য্যগত জীবনে ঈশ্বরানুভব।

"কত অল্পক্ষণ ঈশ্বরের সঙ্গে থাকি! যখন তাঁর কাছে যাই, তখনও কয়েক নিমেষের অধিক থাকি না; আর এই নিমেষগুলি একত্র করিলে দিন রাত্রির মধ্যে এক ঘণ্টাও হয় কিনা সন্দেহ; অবশিষ্ট জীবন তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে; শুষ্কভাবে, অবসন্নভাবে, তাঁহার সহবাসের মধুরতা ও পবিত্রতাশূন্য হইয়া সে সময় একাকী অতিবাহিত করি। কি

দুর্দ্দশা !!" পাঠক, তোমারও কি এ দশা ? তোমার কি আমার অবস্থার সহিত সহানুভুতি আছে ? যদি তাহাই হয়, তবে চল একত্রে বসিয়া এই ক্লেশকর অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে চল একবার আমাদের অবস্থাটা ভাল করিয়া দেখি ; দেখি আমাদের কষ্ট কি, আর আমরা কি চাই।

নিয়মিত উপাসনার সময়ে আমরা অল্পাধিক পরিমাণে ঈশ্বর সহবাস লাভ করি ; হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র আবির্ভাব অনুভব করি, তাঁহার পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আভাস পাই, তাঁহার প্রেম অনুভব করিয়া হৃদয় বিগলিত হয়, আর তাঁহার সহিত আমাদের যে নিকট সম্বন্ধ, কথঞ্চিৎ স্পষ্টভাবে তাহা বুঝিতে পারি। বুঝিতে পারি যে তাঁহাকে জানা, তাঁহাকে ভালবাসা আর তাঁহার সেবার জন্যই আমাদের জীবন ; আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই তাঁর এবং তাঁকেই দিতে হইবে। উপাসনার সময়ে অল্পাধিক পরিমাণে, এই সমুদায় অনুভব করি, সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমাদেব কার্য্যগতজীবন, যাহা সমগ্র জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং (অনেক বিষয়ে) সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অংশ, সেই জীবন আর এই পবিত্র সময়ে কত প্রভেদ ! এই সময়ের সুন্দর আলোক, এই সময়ের মধুর প্রেম, এই সময়ের জীবনপ্রদ উৎসাহ—কার্য্যগত জীবনে তৎসমুদায়ের কিছুই থাকে না। চক্ষু কেবল বাহিরের বস্তুই দেখে, হৃদয় কেবল সাংসারিক তৃপ্তিপ্রদ বস্তুতেই আকৃষ্ট হয়,—আর হস্ত যদি কার্য্য করে, তবে কেবল সেরূপ কার্য্যই করে, যাহাতে নিজের সুখ হয়, অথবা যাহাকে সুখী করিতে চাই এমন কোন ব্যক্তির সুখ

হয়। এই চিত্র অতি কষ্টকর, সন্দেহ নাই; কিন্তু অতি নির্দ্দোষ এবং কার্য্যতঃ অতি উৎকৃষ্ট জীবনও অনেক স্থলেই এই চিত্রের অনুরূপ। দোষ-শূন্য, এমন কি সৎকার্য্যে পরিপূর্ণ হইলেও জীবন গভীর ঈশ্বরানুভবে পরিপূর্ণ না হইতে পারে। কিয়ৎ পরিমাণ কর্ত্তব্য জ্ঞান আর কোন সাংসারিক উন্নতির আশা, অথবা কোন উচ্চতর বিষয়ে রুচি এরূপ কোন কার্য্যকরী শক্তি হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিলেই জীবন পাপ কার্য্য, আলস্য ও জড়তা হইতে মুক্ত থাকিতে পারে; এমন কি, দৃশ্যতঃ অনুকরণ-যোগ্য বলিয়াও বোধ হইতে পারে। কিন্তু হায়! ঈশ্বরেব প্রকৃত উপাসক এবং সেবকের উপযুক্ত আদর্শ জীবনের সহিত এরূপ জীবনের কত প্রভেদ! যে জীবন নব জীবনপ্রদ ঈশ্বরানুভবে পরিপূর্ণ নহে, প্রকৃত ধর্ম্মের চক্ষে সে জীবন অসার। সেই "একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তুই" যদি না পাইলাম তবে "বহু বিষয়ে যত্নবান্ এবং চিন্তিত" হইয়া কি লাভ?* প্রকৃত ব্রহ্ম-সেবক দৈনিক কার্য্য হইতে অবসৃত হইলে তাঁহার হৃদয়ে যে স্বর্গীয় শান্তি এবং আরামের উদয় হয়, ঈশ্বরের প্রশংসা ও প্রসন্নতারূপ যে অমূল্য রত্ন লাভ করেন—তৎসমুদায় ঈশ্বর-সহবাসশূন্য শুষ্ককর্ম্মীব ভাগ্যে কদাচ ঘটে না। এরূপ ব্যক্তি উপাসনা শিখিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সেবা শিখেন নাই। তাঁহার উপাসনা স্বর্গের আলোক ও উত্তাপ-পরিপূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জীবন অন্ধকার এবং হিমশিলাপূর্ণ কেন্দ্র প্রদেশে অবস্থিত, সন্দেহ নাই।

আমাদের উপাসনা এবং কার্য্যগত-জীবনের এই পার্থক্যের

* বাইবলের অন্তভাগ—লুক ১০।৩৮—৪২। মেরি ও মার্থার উপাখ্যান।

কারণান্বেষণের জন্য বহু দূরে যাইতে হয় না। আমরা কার্য্যগত-জীবনে যে ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা অনুভব করি না, তাঁহাকে এবং তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধের কথা যে ভুলিয়া থাকি, তাহার কারণ এই যে, যে সমুদায় প্রবৃত্তি (Motives) আমাদের জীবনের পরিচালক সে সমুদায় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিবার পক্ষে,—আমাদিগকে তাঁহার নিকটবর্ত্তী করিবার পক্ষে—কিছু-মাত্র উপযোগী নহে। আমরা অনেক সময়ই সুখের জন্য, অর্থের জন্য বা যশের জন্য কার্য্য করি, আর যদি কখনো কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুরোধে কার্য্য করি, তখনও ভাবিয়া দেখি না যে কর্ত্তব্য জ্ঞান ঈশ্বরের আদেশ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, অতিশয় উচ্চ শ্রেণীর কার্য্যও আমরা অনেক সময় এমন নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়া করি, যাহা নিজ আত্মার নিকট স্বীকার করিতেও লজ্জা হয়। আবার অনেক সময় অতি বিশুদ্ধ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেও তীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি ও সমুচিত ধর্ম্মবলের অভাবে কিরূপে যে ক্রমে ক্রমে সে কার্য্য নীচতর প্রবৃত্তির অধিকার-গ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা দেখিলে আরো আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যতদিন এই অবস্থা থাকে, যতদিন হৃদয় সাংসারিক প্রবৃত্তির অধীন থাকে, ততদিন কার্য্য-গতজীবন অন্ধকারময় শুষ্ক মরুভূমি তুল্য থাকিবে, ইহা আর বিচিত্র কি? সুতরাং জীবনকে ঈশ্বরাবির্ভাবে জ্যোতির্ম্ময় ও মধুময় করিতে হইলে আমাদিগকে এই সাধন অবলম্বন করিতে হইবে :—

সর্ব্বদা দায়িত্ববোধের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে যত্নবান্ হইতে হইবে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদায় কর্ত্তব্য এই স্বর্গীয় প্রবৃত্তির

অধীনে আনিতে হইবে। অন্তরে আত্ম-দৃষ্টি জাগ্রত রাখিয়া নীচ সংসারিক বাসনা সমূহ উদয়োন্মুখ হওয়া মাত্রই দূর করিয়া দিতে হইবে। দেখিতে হইবে যেন সুখ লালসা, ধন লালসা, যশো লালসা হৃদয়ের উপর আধিপত্য লাভ না করে, এবং কার্য্যের পরিচালক হইয়া না উঠে। এই সমুদায় বাসনা নানা ছদ্মবেশ ধরিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে এবং আত্মার বিশুদ্ধতম প্রবৃত্তি সমূহের সহিতও মিশ্রিত হইয়া যায়; স্থায়ী প্রার্থনার ভাব এবং সতর্কতা ব্যতীত এই সমুদায় ছদ্মবেশ চিনিতে পারা অসম্ভব। প্রকৃত জ্ঞানীগণ তাহা জানিয়াই বলেন "সতর্ক-ভাবে থাক এবং প্রার্থনা কর, নতুবা প্রলোভনে পড়িতে হইবে।" প্রথমতঃ এরূপভাবে জীবনের কার্য্য প্রণালী স্থির করিতে হইবে, যাহাতে সমগ্রভাবে ঈশ্বর সেবায় সমর্থ হওয়া যায়, যাহাতে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ হৃদয় ও জীবন সংগঠিত হইতে পারে। তৎপর এরূপ অভ্যাস করিতে হইবে যেন এই কার্য্য প্রণালীর প্রত্যেক কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়ে প্রার্থনা করিয়া আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে ইহা গভীরভাবে অনুভব করিতে হইবে যে, আমি আমার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হইতেছি। এইরূপে ব্যাকুল প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষার সহিত সম্মিলিত না রাখিলে আমাদের উচ্চতম, বিশুদ্ধতম কর্ত্তব্য গুলিও শুষ্ক কার্য্য হইয়া উঠে, তাহাদের উচ্চতা বিশুদ্ধ আর থাকে না। তেমনি আবার গভীর প্রার্থনার সহিত সম্মিলিত হইলে ক্ষুদ্রতম কর্ত্তব্যগুলিও উচ্চ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব আমাদিগকে এই করিতে হইবে,—সমস্ত জীবনে গাঢ় দায়িত্ব বোধ—কর্ত্তব্যবোধ ব্যাপ্ত করিতে হইবে, সমুদায় চিন্তা, ভাব ও

কার্য্যে ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেখিতে হইবে জীবনের বিশুদ্ধ মুহূর্ত্তে যে সকল প্রবৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখি সে সমস্ত নীচ প্রবৃত্তি যেন কার্য্যের পরিচালক না হয়। আর এই সমুদায়ের উপায় স্বরূপ যে নিয়ত-প্রার্থনা তাহা অতি যত্নে সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীবন আর অন্ধকারময় শুষ্ক মরুভূমি তুল্য থাকিবে না। তাহা হইলে, যেমন উপাসনাকালে তেমনি জীবনেও আমরা ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরানুভব, ঈশ্বর প্রীতি লাভ করিব, এবং উপাসনা যেমন পবিত্র, কার্য্যও তেমনি পবিত্র হইবে।

সম্পূর্ণ।

By the same author.

GLEAMS OF THE NEW LIGHT.

BEING

Essays expository of some leading principles of Pure Theism, doctrinal and practical.

Price Five Annas, Postage Half Anna.

EXTRACTS FROM OPINIONS.

ইহার আলোকে অনেক সুশিক্ষিত যুবকের চক্ষু খুলিয়া যাইবে এবং হৃদয়ে ঈশ্বর প্রেমের ও সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে। এই গ্রন্থ ··· চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মভাবের পরিচয় দিতেছে। - *Maharshi Debendranath Thakur.*

··· You have evinced remarkable ability in handling the very important subjects treated of in them. Your lucidity of exposition does great credit to you.—*Babu Rajnarain Basu,*

Warm all over with a genuine piety.

—Rev. C. Voysey.

···Your book ··· contains practical suggestions as regards devotional culture which will be of the greatest service to sincere religious inquirers. No one can read your book without admiring the fervent religious spirit which carried you throughout in embodying noble thoughts in noble language.—*Babu Umes Chandra Datta, B. A.*

·· They are not only teeming with precious thoughts, but, what I value more, they have been

written throughout in a devout spirit; consequently, the book ... will be an excellent aid to our devotion.—*Pandit Sivanath Sastri, M. A.*

... Its language is simple, pure, and in places impressive, and it deals with subjects of the highest moment to the human soul.—*A. M. Bose Esq. M A.*

আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে...পরমার্থতত্ত্বে গাঢ়াভিনিবেশ, উচ্চ সাধন, ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় পাইয়া...বার বার সাধুবাদ প্রদান করিলাম ও...ভাষার ওজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করিলাম...।—*Tatvabodhini Patrika.*

...গ্রন্থকার যে সকল প্রশংসা বাক্য গ্রন্থের আচ্ছাদনীতে মুদ্রিত করিয়াছেন, আমরা আমাদিগের দেয় প্রশংসাও তৎস আহ্লাদের সহিত মিলিত করিতেছি। উপাসনাহীনতা, শুষ্কতা ও অবিশ্বাস যাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে, তাহাদিগের একজনকেও যদি এ গ্রন্থ ফিরাইতে পারে, গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইল আমরা মনে করি।—*Dharmatatva.*

...All these subjects are treated of...with such true insight into their nature and bearing, such earnestness and piety, and such beauty of language, that we cannot do better than give a few characteristic extracts &c.—*Subodh Patrika* (Bombay P. S)

...It reflects great credit on the young author and is calculated to prove edifying to our young men if they will only read it in a humble and prayerful spirit—*East.*

এখানি ... উচ্চ সাধন ও উপাসনাশীল জীবনের ছবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ব্রহ্মোপাসনা শিক্ষাভিলাষীগণের পক্ষে এখানি অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক। আলোক।

(ভারতবর্ষীয় ব্রাঃ সঃ)

সকল প্রবন্ধ গুলিই সরল ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ... চিন্তাশীলতা ও ধর্মভাবের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্মপিপাসুগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়।

ধর্মবন্ধু।

☞ To be had of the author at 14, College Street; at the S. B. S. Office, 211, Cornwallis Street; at the Canning Library, and of Messrs M. M. Mazumdar & Co., Pataldanga, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক কলিকাতা—৫০ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে প্রকাশকের নিকট, ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট মজুমদার এণ্ড কোম্পানির দোকানে এবং ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আফিসে—পাওয়া যাইবে।